স্বস্তিকা

৬৪ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা।। ১৬ জুলাই - ২০১২।। ৩১ আষাঢ় - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

জলের বানিজ্যিকীকরন

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮
শিক্ষার চরম অভাবেই ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে শ্রদ্ধা
জানাবার কথা মনে পড়ে না ▯ ৯
কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপানোর সি পি নীতিই
এখন নিয়েছে তৃণমূল ▯ ১০
খোলা চিঠি : তোমার মেয়েরা ভালো নেই গো! ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১
বাস্তব প্রয়োজন ও বোধের অন্বেষণ ▯ ডঃ স্বরূপ ঘোষ ▯ ১২
জল প্রাকৃতিক সম্পদ : দেশবাসীকে নিঃশুল্ক যোগান দিতে
সরকার বাধ্য ▯ বাসুদেব পাল ▯ ১৪
জাতীয় জলনীতির খসড়া প্রস্তাব ১২-য় জোর 'জলের
বাণিজ্যিকীকরণেই' ▯ তারক সাহা ▯ ১৬
জলের সাতকাহন ▯ শংকর পাল ▯ ১৮
তীর্থকথা অমরনাথ ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ২২
বামাক্ষ্যাপার জীবন বৃত্তান্ত ▯ রবীন সেনগুপ্ত ▯ ২৩
দেশভাগে গান্ধীর মৌন নয়, মুখর সম্মতি
ছিল ▯ দীনেশচন্দ্র সিংহ ▯ ২৪
ভারতবর্ষের যুব-নেতৃত্ব ▯ দত্তাত্রেয় হোসবোলে ▯ ২৮
ভারতীয় চলচ্চিত্রের শতবর্ষের প্রাক্কালে
দাদাসাহেব ফালকে ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩০
তালিবানী আফগানিস্তানের পথে বাংলাদেশ ▯ ৩২
সবার আগে আমেরিকাবাসী মূল ভারতীয়রাই ▯ ৩৪
বিশ্ব ও ইউরো সেরা হলেও ব্রাজিলের সমকক্ষ
নয় স্পেন ▯ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৫
দেবদর্শন বারবার সিন্ধু দর্শন একবার ▯ বিজয় আঢ্য ▯ ৩৮
একান্ত সাক্ষাৎকার : লাদাখ জম্মু-কাশ্মীর থেকে আলাদা থাকতে চায়
: রিনচেন শাস্ত্রী ▯ ৪২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ২০ ▯ ▯ ভাবনা-চিন্তা : ২১ ▯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯
সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭ ▯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ ▯ চিত্রকথা : ৪১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ৩১ আষাঢ়, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৪, ১৬ জুলাই - ২০১২

ফঃ ১

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

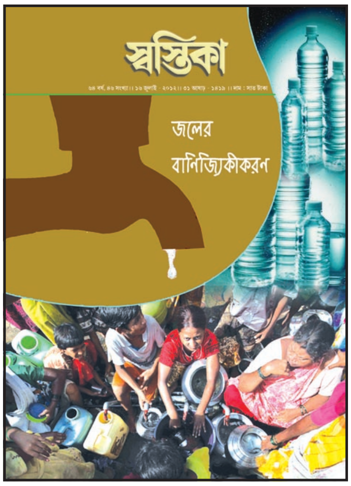

জলের বাণিজ্যিকরণ
পৃঃ ১৪-১৯

দাম : ৭ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬
হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিশেষ বিষয় : সার্ধ-শতবর্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিশ শতকের প্রথম পাদে রবি-কিরণের খরদৃপ্তির মধ্যেও যাঁরা আপন ভাষাপথ খনন করে বঙ্গ সংস্কৃতিকে আলোকিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ওরফে ডি এল রায় অগ্রণী। তাঁর নাটক ও গানে পাওয়া যায় 'প্রহসন' আর নির্ভেজাল 'হাসি'র মিশেল। কিন্তু এই নাটক ও গানেই তিনি এনেছিলেন জাতীয়তাবাদের ছোঁয়া। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটির সার্ধশতবর্ষে (১৯.০৭.১৮৬৩-১৭.০৫.১৯১৩) স্বস্তিকা'র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

লিখেছেন— **বিকাশ ভট্টাচার্য ও অর্ণব নাগ।**

দাম একই থাকছে — সাত টাকা।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

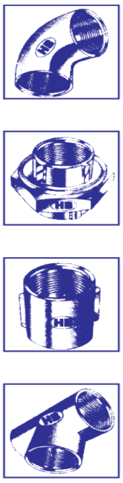

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE ®
স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শৃণ্বন্তু বিশ্বে

হাজার হাজার বছর পূর্বে আমাদের প্রাচীন ঋষিরা কেবল জ্ঞানের মাধ্যমেই প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই বার্তা যে তাঁহারা জানিতে চান এই জগৎকে, তাঁহারা ভেদ করিতে চান সৃষ্টির রহস্য। কিন্তু তাঁহারা জানিবেন কীভাবে? মনে রাখিতে হইবে, বিজ্ঞানের এত সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ভরতা তখন ছিল না। তবে তাঁহাদের ছিল সূক্ষ্ম অনুভব আর ধ্যানের গহন মগ্নতা। আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাঁহাদের ধ্যানের মধ্যে। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন সমগ্র বিশ্বজুড়েই ছড়াইয়া রহিয়াছে সৃষ্টির উপাদান। সুপ্রাচীন কাল হইতে মহাবিশ্বে মহাকাশ মাঝে ভ্রমণ করিতে করিতে ঋষিকুল চৈতন্য সন্ধান করিয়াছে কি সেই সত্য, যাহার সমীপে আদি ও অন্তের আকৃতি ঝরিয়া যায়, ঝরিয়া যায় কাল ও কালাতীতের ভেদ, লুপ্ত হইয়া যায় খণ্ড ও অখণ্ডের বোধ। আজকের বিজ্ঞানও ঠিক এই অনুসন্ধিৎসায় ব্রতী। সমস্ত কালে সেই একই প্রার্থনা করা হইয়াছে— আমায় দাও সেই ধীশক্তি, সেই মেধা, সেই চৈতন্য যাহাতে আমি এই মহাজগৎকে বুঝিতে পারি অর্থাৎ সেই বেদের উক্তি, 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।'

সম্প্রতি পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা সার্ন ঘোষণা করিয়াছে 'নতুন কণা' বা 'নিউ বোসন'-এর অস্তিত্বের কথা। তাহাকে নিবিড় করিয়া পর্যবেক্ষণ করিলে জানা যাইতে পারে মহাজগৎ সৃষ্টির বৃত্তান্ত, জানা যাইতে পারে তাহার চরিত্র ও মহাজাগতিক শক্তির স্বরূপ। পরমাণু হইতেও ক্ষুদ্র কোনও কণিকার অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিতে করিতেই বিজ্ঞানীরা উপনীত হইয়াছেন এই নতুন কণার সমীপে। বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের অভিযাত্রায় এই নবতম আবিষ্কার এক দিকচিহ্ন বিশেষ। ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে যেসব মৌলিক তত্ত্ব এখন তাহার অনেকটাই উদ্ভাসিত হইবে মানবজ্ঞান জগতের এই আবিষ্কারের মাধ্যমে। একদা বরেণ্য বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু যে কণার কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহারও পূর্বে আমাদের ঋষিরা। উপনিষদ বলিতেছে—রসের আস্বাদনের জন্যেই ব্রহ্মের বা আদিসত্তার বহুরূপে প্রকাশ এবং জগতের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই, জানি আমি তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই।' আচার্য শঙ্করের মতে, ব্রহ্মাণ্ডের এই বিচিত্র রূপের ঐশ্বর্য প্রকট না হইলে তাঁহার স্বরূপের মহিমা অগোচরই থাকিয়া যাইত। এই যে রূপে রূপে তাঁহার প্রতিরূপতা তাঁহার প্রতিচ্ছবির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ, এ শুধু নিজের রূপ বা স্বরূপকে জানা এবং জানাবার জন্য। এই জগৎ ব্রহ্মেরই বিচিত্র রূপ। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন কৃষ্ণ। এ যুগের বিজ্ঞানও আমাদের বিশ্বরূপ দেখাইতেছে। জগতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে যাইলেই এই মূলে দেখিতে পাইতেছি শুধু নিরন্তর গতি, এক অবিরাম চলার দুর্বার আবেগ। সৃষ্টির মধ্যে কিসের এত ক্লান্তিহীন যাত্রা, কাহার জন্য এই অন্তহীন অভিসার? আজিকার বিজ্ঞান সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনে ঠিক এই সাধানায় রত। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে কণাবিদ্যার কি এখানেই শেষ? না তাহা নয়। প্রথমত হিগস ছাড়া বিশ্বের যাবতীয় কণারই ভর হইত শূন্য। সেইক্ষেত্রে সকলেই দৌড়াদৌড়ি করিত। ব্রহ্মাণ্ডের তথা বস্তুজগতের কোনও অস্তিত্বই থাকিত না। এটা যেমন সত্য, এই হিগস থাকিলে তাহার ভর কত, সেই ভর অন্যান্য কণাগুলির ভরের পার্থক্য কতটা কি করিতে পারে এবং ইহা কোয়ান্টাম জগৎকে কীভাবে প্রভাবিত করিবে এই গবেষণা কিন্তু চলিতেই থাকিবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

অতীতের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, যখন কোনও প্রবল দিগ্বিজয়ী জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের, অন্যান্য জাতির মিলন ঘটাইয়াছে, নিঃসঙ্গতাপ্রিয় ভারতের একাকিত্ব তখনই ভাঙিয়াছে; যখনই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, তখনই তাহার ফলস্বরূপ সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের আধ্যাত্মিক তরঙ্গের বন্যা ছুটিয়াছে। বর্তমান (ঊনবিংশ) শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বেদের এক প্রাচীন অনুবাদ হইতে জনৈক ফরাসী যুবক-কৃত অস্পষ্ট ল্যাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, 'উপনিষদ্ ব্যতীত সারা পৃথিবীতে হৃদয়ের উন্নতিবিধায়ক আর কোনও গ্রন্থ নাই। জীবৎকালে উহা আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, মৃত্যুকালেও উহাই আমাকে শান্তি দেবে।' অতঃপর সেই বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন, 'গ্রীক সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়ে চিন্তাপ্রণালীতে যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, শীঘ্রই তাহা অপেক্ষা শক্তিশালী ও ব্যাপক পরিবর্তন জগৎ প্রত্যক্ষ করিবে।' আজ তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতেছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

শ্যামাপ্রসাদের অবদান নেহরু-গান্ধীর থেকে কম নয় : শাহনওয়াজ হুসেন

বাসুদেব পাল।। ‘‘ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকলে আজকের ভারতবর্ষের মানচিত্র অন্যরকম হোত। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে কর্মযোগী, যা এদেশের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শ্যামাপ্রসাদের অবদান নেহরুজী বা গান্ধীজীর থেকে কোনও অংশে কম নয়। ধর্মের নামে দেশ ভাগ হয়েছে। তখনকার নেতৃবৃন্দ যদি যুবক হতেন, আরও কিছুদিন লড়াই করতেন, তড়িঘড়ি ক্ষমতায় বসার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন— তাহলে হয়তো দেশ ভাগ হোত না। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হওয়ার ফলে এদেশের মুসলমানদের দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। পাকিস্তানের জেহাদি হামলা তার অন্যতম কারণ।’’

শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতির অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

উপরোক্ত বক্তব্য বিজেপির তরুণ সাংসদ (ভাগলপুর) ও মুখপাত্র শাহনওয়াজ হুসেন এর। তিনি গত ৬ জুলাই সন্ধ্যায় কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মারক সমিতি- পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক ডঃ মুখার্জীর ১১২ তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন— অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুদেরকে জম্মু- কাশ্মীরে আজও নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি। তাঁরা আজও ঝুপড়িতেই (১৯৪৭ থেকে) বসবাস করছেন। প্রসঙ্গত, পাকিস্তান থেকে আগত মুসলমানদের কিন্তু ভারতের নাগরিকত্ব দিয়ে জম্মু-কাশ্মীরে আজও পুনর্বাসন দিচ্ছে রাজ্য সরকার। অনুপ্রবেশ বিষয়েও শ্রীহুসেন পশ্চিমবঙ্গবাসীকে সাবধান করে দেন। তিনি বলেন, তাঁর প্রথম সংসদীয় কেন্দ্র কিসানগঞ্জেই বাংলাদেশী অতিথিদের (পড়ুন অনুপ্রবেশকারী) সংখ্যা সর্বাধিক। তথাকথিত ‘সেকুলারিজম’কে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, কংগ্রেস ও বামপন্থীরা রাজ্যে-রাজ্যে পরস্পর মারামারি চালালেও দিল্লীতে গিয়ে সেকুলারইজম্-এর নামে একজোট হয়ে যান। এক বিচিত্র অবস্থা! আজকের কাশ্মীরকে পূর্বাবস্থায় (শ্যামাপ্রসাদের বলিদানপূর্ব) ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেন্দ্র সরকারের প্রস্তুতিকে তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর কথায়, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর জীবনকে নিত্য অনুশীলন করতে হবে। তাঁর বলিদানকে যিনি অস্বীকার করবেন তিনি দেশভক্তই নন।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বর্তমানে গুয়াহাটির সাংসদ শ্রীমতী বিজয়া চক্রবর্তী বলেন, বাঙালী হিন্দুদের আজও শ্যামাপ্রসাদের মতো পরিত্রাতার প্রয়োজন। তা না হলে অসম, পশ্চিমবঙ্গ এবং আরও অনেক ভারতীয় এলাকা বৃহত্তর বাংলাদেশের অঙ্গীভূত হবে। শ্যামাপ্রসাদ প্রকৃত অর্থেই নির্ভীক দেশপ্রেমিক ছিলেন, মৃত্যু হতে পারে জেনেও তিনি কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। এদিন সভার প্রথম বক্তা অধ্যাপক শ্যামলেশ দাস বলেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন প্রকৃত অর্থে পন্থনিরপেক্ষ ভারতপ্রেমিক। লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের তাঁকে বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আর্কাইভ্‌সের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডঃ প্রণব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ছিলেন অনেক বড়মাপের দেশনেতা, মুক্তি ও ঐক্যের প্রতীক। স্বাধীনতা পূর্ব (১৯৪৭) এবং স্বাধীনোত্তর ভারতে তাঁর ভূমিকা ছিল অনবদ্য। বিজেপি’র রাজ্য সভাপতি রাহুল সিন্‌হা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মতো মনীষী ও শহীদের বলিদানকে ভুলিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রকে বিফল করার আহ্বান জানান। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রবীণ বিজেপি নেতা তপন সিকদার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের শ্যামাপ্রসাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব ও ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করেন। শ্যামাপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল ব্যবহারের জন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতিকে তাঁর জন্মদিন পালনে ব্যবহারের জন্য কোনও দিন ট্যাক্স দিতে হয়নি। এবারই রাজ্যের পরিবর্তনপন্থী সরকার ১৮২০ টাকা কর নিয়েছে বলে শ্রী সিকদার জানান। হলভর্তি সভাগারে ধ্বনি ওঠে ‘শেম’ ‘শেম’।

অন্যান্য বক্তার মধ্যে ছিলেন সর্বভারতীয় নেতা চন্দন মিত্র, লেখক নিখিলেশ গুহ, তপন ঘোষ, মেজর জেনারেল কে কে গাঙ্গুলী, অমিতাভ ঘোষ প্রমুখ। সভার শুরুতে সংস্কার ভারতীর দক্ষিণ কলকাতা শাখার শিল্পীরা শ্যামাপ্রসাদের জীবনীভিত্তিক গীতি-আলেখ্য (কথা ও গানে) পরিবেশন করেন। শুরুতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন শাহনওয়াজ হুসেন এবং মঞ্চস্থ নেতৃবৃন্দ। সুললিত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ পরিবেশন করেন বিকাশ ভট্টাচার্য। সভা পরিচালনা করেন প্রবীণ বিজেপি নেতা ডঃ দেবব্রত চৌধুরী এবং পৌরোহিত্য করেন সমিতির সভাপতি ডঃ পবিত্র গুপ্ত। সমিতির স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে পুরো অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মিহির সাহা, তিনিই শেষে ধন্যবাদ জানান। এদিন বিজেপি নেতা এবং বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ দিবাকর কুণ্ডু লিখিত পুস্তক ‘Relevance of Dr. Shyamaprasad's thoughts in the New Millennium’ পুস্তকের আবরণ উন্মোচন করেন সভাপতি ডঃ পবিত্র গুপ্ত। শ্রীকুণ্ডু মঞ্চস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে বই তুলে দেন।

সংবাদ প্রতিবেদন

উত্তরপ্রদেশে পুরভোটে বিজেপির ব্যাপক সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সদ্যসমাপ্ত পুরভোটে উত্তরপ্রদেশে অন্য সব দলকে পিছনে ফেলে বিজেপি ব্যাপক সাফল্যলাভ করেছে। এর আগে দিল্লী, মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবেও স্থানীয় নির্বাচনে বিজেপি ভালো ফল করেছে। উত্তরপ্রদেশের বারোটি বড় শহরের মধ্যে দশটিতেই মেয়র পদে বিজেপি প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। শহরগুলি হলো— লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, বারাণসী, কানপুর, মীরাট, গাজিয়াবাদ, মোরাদাবাদ, গোরখপুর, আলিগড় এবং ঝাঁসি। এলাহাবাদ এবং বেরিলিতে যথাক্রমে মায়াবতী ও মুলায়মের দল জয়ী হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে খারাপ ফলের পর এই সাফল্যে বিজেপি কর্মীরা স্বভাবতই উল্লসিত।

উত্তরপ্রদেশে চারদফায় সম্প্রতি এই নির্বাচন হয়। বিজেপির পক্ষে বেশি করে উল্লসিত হওয়ার কারণ হলো, বিজেপি ও কংগ্রেস দলের মেয়র পদপ্রার্থীরা দলীয় প্রতীকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন। অপরপক্ষে দিল্লী ও মুম্বাই কর্পোরেশনে গোহারা হওয়ার পর উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে। সোনিয়ার দল গতবারের জেতা তিনটি মেয়র পদের একটিতেও জিততে পারেনি। বেরিলি এবং ঝাঁসি লোকসভা আসনে ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে জেতার পরও মেয়র পদে জিততে ব্যর্থ।

নেহরু-গান্ধী পরিবারের দুর্গ বলে কথিত আমেথি এবং রায়বেরিলির মতো জেলাতেও জেলা পঞ্চায়েত এবং নগরপালিকায় জিততে পারেনি। বিশ্লেষকদের মতে টীম আন্নার দুর্নীতি বিরোধী প্রচারের ফলেই শহুরে ভোটারদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষ বিজেপি'র প্রতি ভরসা করে ভোট দিয়েছে।

লক্ষ্ণৌতে মেয়র পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপির অধ্যাপক দীনেশ শর্মা। তিনি এক লক্ষ সতেরো হাজার ভোট পেয়েছেন। এটা রাজ্যে সর্বাধিক। মোরাদাবাদে বিজেপি প্রার্থী বীণা আগরওয়াল তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পীস পার্টির হুমায়ুন কবীরকে ৭০,১১১ ভোটে পরাজিত করেছেন। গোরখপুরে বিজেপি-র সত্য পাণ্ডে কংগ্রেসের সুজিত করিমকে ৩৩,১৫৬ ভোটে পরাজিত করেছেন। ঝাঁসিতে বিজেপি-র কিরণ রাজু কংগ্রেসের নির্মলা ভিলারিয়াকে ২৫,৬৬৯ ভোটে পরাজিত করেছেন। মীরাটে বিজেপি'র মেয়র পদপ্রার্থী হরিকান্ত আলুওয়ালিয়া সমাজবাদী পার্টির সমর্থিত প্রার্থী রাজিক আনসারিকে ৭০,০০০ ভোটে পরাজিত করেছেন। উত্তরপ্রদেশে বিজেপির রাজ্য-সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত বাজপেয়ির দাবি রাজ্যে সমাজবাদী পার্টির সরকারের প্রতি মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে। অখিলেশ যাদব সরকারের ১১৫ দিনের মধুচন্দ্রিমা শেষ। শ্রী বাজপেয়ীর বক্তব্য আমি নয়, আমরা সকলে মিলে লড়াই করেছি। তিনি বিজেপি সাংসদ বরুণ গান্ধী, কলরাজ মিশ্র এবং বিনয় কাটিয়ার সহ অন্যদেরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

কংগ্রেস আগেরবার ঝাঁসি, এলাহাবাদ এবং বেরেলিতে জিতেছিল। এবার সর্বত্র হেরেছে। এখানে উল্লেখ্য— বিজেপি এবং কংগ্রেস দলীয় প্রতীকে লড়াই করলেও সপা ও বসপা দলীয় প্রতীক ছাড়াই নির্বাচনী ময়দানে নেমেছিল। রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার এস কে আগরওয়াল জানিয়েছেন যে বারোটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ১৮৬টি নগরপালিকা এবং ৩৮৮টি নগর পঞ্চায়েতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংখ্যালঘু ভোটের লোভে বি এস এফ-কে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে

তরুণ কুমার পণ্ডিত॥ মালদা জেলার বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে গো-পাচারের ঘটনা নতুন কিছু নয়। কিন্তু সীমান্তে বি এস এফ জওয়ানদের নিরস্ত্র অবস্থায় থাকা এবং গুলি চালানো বন্ধ করায় পাচারকারীদের পাল্টা আক্রমণে জওয়ানরা বিপাকে পড়েছে এবং মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এমনি একটি ঘটনা গত ২ জুলাই মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের বৈদ্যপুরে ঘটেছে। দুই বি এস এফ জওয়ান মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সীমান্তে গুলি চালানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও আত্মরক্ষার্থে তারা গুলি চালাতে বাধ্য হয়। ফলে আব্দুল আলিম (২২) নামে এক গো-পাচারকারীর মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে সোমবার গভীর রাত্রে ২০ নম্বর ব্যাটালিয়ানের শোভাপুর বি এস এফ ক্যাম্পের কাছে কাঁটাতারের বেড়া কেটে কিছু লোক গোরু পাচার করছিল। সেই সময় ২০ নম্বর ব্যাটালিয়ানের কর্তব্যরত দুই জওয়ান ইন্দ্রজিৎ সিং ও সঞ্জয় দাস পাচারকারীদের থামতে নির্দেশ দেন। কিন্তু দুষ্কৃতীরা কথা না শুনে গোরু পাচার করতে থাকে। বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতীরা হাসুয়া নিয়ে চড়াও হয় এবং কোপ মারে। দুজন জওয়ান পরিস্থিতি দেখে নিজেদের বাঁচাতে গুলি ছুঁড়ে এবং তাতেই এক দুষ্কৃতী মারা যায়। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করছেন বি এস এফ বুলেট চালাতে পারেন না, রবার বুলেট বা জল কামান ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যেখানে মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন রয়েছে সেখানে রবার বুলেট ব্যবহার করলে জওয়ানদের রক্ষা করতে পারবে?

তাছাড়া আরও প্রশ্ন উঠেছে এইভাবে বি এস এফ-কে সীমান্তে নিরস্ত্র করে কি সরকার চোরাকারবারীদের মদত দিচ্ছে না? নাকি এখানেও সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ককে রক্ষা করতে গ্রামাবাসীদের অন্যায় আবদারের কাছে মাথা নত করে বি এস এফ-কে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বি এস এফ বলেছে আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালানো অন্যায় নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বি এস এফ গুলি চালাতে পারে না বলে গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য হাবিবুর রহমান জানিয়েছেন। বি এস এফ ৫ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে মালদা সদর হাসপাতালে যে দুজন বি এস এফ জওয়ান পড়ে রয়েছে তাদের প্রতি কোনও সহানুভূতি নেই কেন? সীমান্তে অপরাধে বাধা দিতে গিয়ে কি দুই জওয়ান অন্যায় কাজ করেছে? উত্তর কে দেবে? রাজ্য সরকার না কেন্দ্র সরকার?

সি বি আইয়ের কালো তালিকায় সতর্ক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি সি বি আই কেন্দ্র সরকারের হাতে ২৩ জন অনভিপ্রেত ব্যক্তির নামের তালিকা তুলে দিয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সি বি আই-এর অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে এরা লবিবাজ, ক্ষমতার দালাল, ঘুষ প্রদানকারী, বিভিন্ন ব্যবসায়িক লেনদেন-এ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করত। ওদের ঘোরাফেরা ছিল বেশ কয়েকটি শাঁসালো দপ্তরে— প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, কয়লা এবং বিদ্যুৎ, টেলিকম এবং জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত। সি বি আই এদেরকে 'আনডিজায়ারেবেল কন্টাক্ট মেন' (UCM) বলে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ তালিকা সি বি আই ভিজিল্যান্স এবং দুর্নীতি দমন বিভাগের নির্দেশ অনুযায়ী তৈরি করেছে।

প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে, এই তালিকার বিষয়টা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের তালিকা তৈরির সময় খেয়াল রাখা হবে। সাধারণভাবে ওই সকল ধান্দাবাজ নিম্নরুচির ব্যক্তিদেরকে কোনও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের অধিকৃত প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হবে না। বিভিন্ন মন্ত্রক, সরকার অধিগৃহীত সংস্থার অফিসারদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে ওইসব ব্যক্তিদের নাম আদৌও বিবেচনা না করা হয় এবং তাদের থেকে কোনওরকম আতিথেয়তা, উপহার কেউ না নেন। এমনকী সামাজিকতার সম্পর্কও না রাখেন।

সম্প্রতি সিবিআই বিভিন্ন মন্ত্রক এবং দপ্তরে এরকমই সার্কুলার পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে।

সি বি আই এর কালো তালিকাভুক্ত তেইশ জনই পুরুষ। ১৩ জনকে পাওয়া গেছে— অর্থমন্ত্রক, আর্থিক লেনদেন বিষয়সংক্রান্ত— আয়কর, কাস্টমস্ এবং এক্সাইজ দপ্তরে ঘোরাঘুরি করার সময়। এরাই আবার কয়লা, বিদ্যুৎ, প্রতিরক্ষা বিভাগের মতো শাঁসালো দপ্তরে নিয়মিত যাতায়াত করে। সি বি আই আবার জনাসাতেক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে যারা বিভিন্ন অস্ত্র কোম্পানীর হয়ে 'লবি' করত— প্রতিরক্ষা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র বিভাগ এবং দিল্লী পুলিশের কাছেও।

২৩ জনের চৌদ্দ জনই দিল্লীর বাসিন্দা। প্রাক্তন নৌসেনা প্রধান এস এম নন্দার বিতর্কিত পুত্র সুরেশ নন্দা এবং তার সহযোগী সুধীর চৌধুরীর নামও রয়েছে ওই তালিকায়। অন্যদের নাম— বিনোদ কুমার বিন্দাল, সঞ্জীব কুমার বিন্দাল, রঞ্জিত সিন্হা, রাজীব সিং, যতিন্দর পাল সিং, কিশোর আগরওয়াল, রবীন্দর কুমার খেড়া, গোপালকৃষ্ণ কেডিয়া, আশিস বোস ওরফে বাবলু, প্রদীপ সিং রানা, মহিন্দর সিং সাইনি এবং আশুতোষ ভার্মা।

রয়েছে কলকাতার বাসিন্দা সঞ্জয় কুমার পসারির নাম। তাকে কোল ইন্ডিয়ার অফিসারদের ঘুস দেওয়ার সময় ধরা হয়েছিল। পসারি এই তালিকায় নতুন সংযোজন। পসারিকে ধরেছিল আমেরিকান অফিসাররা। আমেরিকা তার ২০০০ কোটি টাকা জরিমানা করে। জেনেভার আন্তর্জাতিক আদালত তার সবকটি একাউন্ট ফ্রীজ (বন্ধ) করে দিয়েছে। সঞ্জয় কয়লা ও খনি বিভাগে দালালি করত। সে বহুজাতিক খনি মালিক 'বুসাইরাস'-এর এজেন্ট হিসেবে কাজ করত। বুসাইরাস বর্তমানে ক্যাটারপিলার-এর সঙ্গে মিশে গেছে। জেনেভার আদালত ২০১১-র ১৬ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনে তার বিচার করে রায় দিয়েছে। সুইজারল্যান্ডের লয়েডস্ টি এস বি ব্যাঙ্কে সঞ্জয়ের বিভিন্ন নামে চারটি একাউন্ট রয়েছে। সঞ্জয় পসারি--- এ সি নং-২৯৫২৩৩৪, রাজীব পসারি (ভাই)— এ সি নং-১৯৯৬০৯০, তাদের সংস্থা সাভনফাউন্ডেশন এ/সি নং-১১৫৯০২৪, তাদেরই কোম্পানী-ইনফোটেক গুয়েনসে এ/সি নং- ১৮৯৫০২ প্রভৃতি। এখনও ভারতের পক্ষ থেকে ঘুসের টাকা ফেরৎ আনার কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। অথচ খনিজ সম্পদ উত্তোলনে সরকারের ক্ষতি হয়েছে এই অজুহাতে একের পর এক মামলায় বিজেপি নেতা ইয়েদুরাপ্পা জেলে যান, একাধিক মামলা দায়ের হয়।

একাধিক দক্ষিণ ভারতীয় মন্ত্রী, সাংসদ জেলে গেলেও সি বি আই-এর কালো তালিকায় দক্ষিণ ভারত থেকে একমাত্র নাম চেন্নাইবাসী এন সুদীন্দ্রণ। সে গাড়ী ব্যবসায়ীদের দালাল। সি বি আই বলছে— সুদীন্দ্রণ- এর কর্মপরিধির মধ্যে রয়েছে সেন্ট্রাল এক্সাইজ, কাস্টমস্ এবং ডি আর আই। বিগত আট বছর যাবৎ ডি এম কে দলের এস এস পালানিমানিকম্ এইসব দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

সি বি আই তার নির্দেশনামায় আরও বলেছে— ''সরকারি অফিসারদের ওইসব অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকতে বলতে হবে। এদের ক্ষতিকারক গতিবিধি কোনও সরকারি প্রকল্পে গ্রাহ্য করা হবে না। বিদেশী সংস্থাদেরকেও এদের বিষয়ে জানাতে হবে। ওদের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।''

এসব কথাবার্তা সি বি আই বিভাগীয় প্রধান, সচিব এবং ভিজিল্যান্স দপ্তরকে জানিয়ে দিয়েছে।

বইয়ের এজেন্ট চাই
নবম-দশম-একাদশ-দ্বাদশ ও ডিগ্রি কোর্ষের বই বিক্রয়ের জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গে ব্লক ভিত্তিক এজেন্সি দিতে চাই।
সম্পূর্ণ পোষ্টাল ঠিকানা দিয়ে এস.এম.এস করুন ৯৮৩২০৪৩৫১৫ নম্বরে।
বই - এস.রায় সম্পাদিত "লেটার মার্ক A+"

শিক্ষার চরম অভাবেই ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে শ্রদ্ধা জানাবার কথা মনে পড়ে না

গূঢ়পুরুষের কলম

প্রয়াত জ্যোতি বসুর জন্মদিন পালনকে কেন্দ্র করে সিপিএম এবং তৃণমূল নেতারা যে নোংরা রাজনীতির খেউড় রাজ্যবাসীকে শোনালেন এবং দেখালেন এক কথায় তা বাঙালির সুস্থ মানসিকতা ও সংস্কৃতির পরিচয় নয়। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের প্রয়াত কৃতি সন্তানদের জন্মদিন সাড়ম্বরে পালন করার রীতি চালু করেছেন। তবে রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে সকল কৃতি সন্তানের নয়। মমতার ব্যক্তিগত পছন্দের তালিকায় যাঁরা আছেন একমাত্র তাঁদের জন্মদিনে তৈলচিত্রে মুখ্যমন্ত্রী মালা দেন। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি ক্ষমতায় থাকার সময় সিপিএম বেছে বেছে একমাত্র প্রয়াত বামপন্থী নেতাদের জন্মদিনে তাঁদের ছবিতে মালা দিতেন। কম্যুনিস্ট না হলে সরকারি শ্রদ্ধা পাওয়া যেত না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর পছন্দের মৃত নেতাদের জন্মদিন পালন করেন। তাই দেশভাগের সময় পাকিস্তানের কবল থেকে পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করার সেনাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন রাজ্য সরকার পালন করে না। সিপিএম করেনি। তৃণমূল সরকারও করে না। তাতে অবশ্য বাঙালি তথা ভারতের গৌরব শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মত্যাগের মূল্য বিন্দুমাত্র কমে না। ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় তিনি কারাগারে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। এমন একজন বরেণ্য দেশপ্রেমিকের প্রতি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো রাজ্য স্তরের মুখ্যমন্ত্রীরা প্রতিকৃতিতে মালা দিলেন কিনা তাতে কিছুই যায় আসে না। আসলে এইসব ছোট ছোট নেতা নেত্রীর তাঁদের ক্ষুদ্র দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থের উপরে কিছুতেই উঠতে পারেন না।

সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ফেসবুকে লিখেছেন, ভারতে 'মেরুদণ্ডহীন তথাকথিত রাজনৈতিক নেতার সংখ্যা বেড়ে চলেছে।' সঠিকভাবে লিখলে লেখা উচিত ছিল, মেরুদণ্ডহীন, অশিক্ষিত, ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতা নেত্রীর সংখ্যা...। শিক্ষার চরম অভাবেই ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মতো মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা জানাবার কথা মনে পড়ে না। মমতা লিখেছেন, মেরুদণ্ডহীন রাজনৈতিক নেতা। নেত্রী কথাটাও যুদ্ধ থাকা উচিত ছিল।

কারণ, দেশের বড় রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের প্রধান চালিকা সোনিয়া গান্ধী একজন রাজনৈতিক নেত্রী। উত্তরপ্রদেশে সদ্য ক্ষমতাচ্যুত দল বি এস পি-র মায়াবতী একজন নেত্রী।

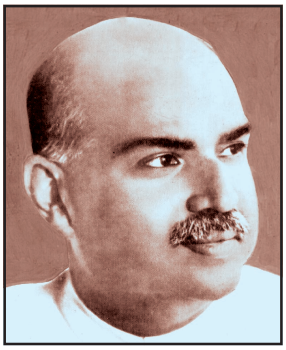

দক্ষিণে এ আই এ ডি এমকে নেত্রী জয়ললিতা একজন পোড় খাওয়া রাজনৈতিক নেত্রী। ফেসবুকের লেখিকা নিজেই পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের জননী-নেত্রী। একবার নিরপেক্ষভাবে বিচার করে বলুন তো, মেরুদণ্ডহীন, অশিক্ষিত, ক্ষমতালোভী এই তিনটি কথার যে কোনও একটি কথা নেত্রীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কিনা। প্রথমে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হয়। মমতা একতরফাভাবে ঘোষণা করে দেন যে ডাঃ রায়ের জন্ম ও মৃত্যুদিন ১ জুলাই রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় সরকারিভাবে ওই দিনটি ২৯ জুন শুক্রবার পালন করা হবে। জন্মাবার দু'দিন আগেই জন্মদিন পালনের কথা বাঙালি অতীতে ভাবেনি। বরং নির্দিষ্ট দিনে জন্মদিনের উৎসব পালন করা না গেলে পরে করার রীতি এই রাজ্যে আছে। অদূর ভবিষ্যতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন ২৩ জানুয়ারি তারিখের বদল করে নভেম্বর বা ডিসেম্বরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। একেই বলে অশিক্ষিত ভণ্ড রাজনীতি। রবিবার সরকারি ছুটি থাকায় ডাঃ রায়ের জন্মদিনে মুখ্যমন্ত্রী মাল্যদান করতে পারবেন না। তাই ২৯ জুন ডাঃ রায়ের জন্মদিন পালন করা হলো। চমৎকার যুক্তি। এমন আজব যুক্তি মানলে ১৫ আগস্ট এবং ২৬ জানুয়ারি ছুটির দিন হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন সমারোহে উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় জ্যোতি বসুর জন্মদিন পালনকে কেন্দ্র করে। জ্যোতিবাবুর জন্ম তারিখটিও ছিল রবিবার, ৮ জুলাই। অথচ ৬ জুলাই শুক্রবার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন শেষ হচ্ছে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ৬ জুলাই জ্যোতিবাবুর জন্মদিন সরকারিভাবে পালন করা হয়। গোঁসা করে সিপিএম বিধায়করা বিধানসভায় সরকারি অনুষ্ঠান বয়কট করেন। সিপিএম রাজ্য নেতৃত্ব স্থির করে ৮ জুলাই রবিবারেই জ্যোতিবাবুর জন্মদিন বিধানসভা ভবনে পালন করা হবে। মমতার নির্দেশে বিধানসভার অধ্যক্ষ অনুমতি দেননি। এই জন্মদিন পালন করাকে কেন্দ্র করে রাজ্যে যে নোংরা রাজনীতি চলছে তাকে যদি ক্ষমতালোভী অশিক্ষিত রাজনীতিকদের খেলা বলি তবে কী ভুল হবে।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(নে

মাত্র দুই মিনিটে (ৈর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

রাজ্য রাজনীতি

কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপানোর সি পি এম-নীতিই এখন নিয়েছে তৃণমূল

নিশাকর সোম

রাজ্যে এক তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে— সে তরঙ্গ হলো কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত। সে-কথায় যাবার আগে সিপিএমের কথা পাড়ি। প্রণব মুখার্জি-র প্রার্থীপদ সমর্থন করা নিয়ে সিপিএমের সদর দফতরের কর্মী বিদ্রোহ করে বহিষ্কৃত হলেন। তিনি বলেছেন, জে এন ইউ-এর ছাত্ররা এস এফ আই ত্যাগ করছে। আর এস পি ও সিপিআই সিপিএমের সমর্থনের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। কিন্তু এটা পরিস্কার পশ্চিমবঙ্গের পার্টিকর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইউপিএ-১ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করাকে অনভিপ্রেত বলে মনে করে। এ রাজ্যের সমস্ত স্তরের পার্টি সম্মেলনে এই সমর্থন প্রত্যাহারকে হঠকারী— ভুল বলে অভিহিত করা হয়েছিল। এ রাজ্যের সিপিএমের মাজা-ভাঙা অবস্থা। তাতে কংগ্রেসের লেজ ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করাটাই স্বাভাবিক। অপরপক্ষে এ রাজ্যের কংগ্রেসও তৃণমূলের 'আগ্রাসন' রুখতে 'শত্রুর শত্রু আমার মিত্র' এই নীতি নিচ্ছে। রেজ্জাক মোল্লাকে আপাতত রুখে দেওয়া গিয়েছে। কিন্তু রেজ্জাক যতদিন না রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে স্থান পাচ্ছেন ততদিন তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি করে জ্বলবেন এবং জ্বালাবেন।

বহিষ্কৃত অনিল বসুর পাল্টা-সংগঠন সম্পর্কে যত কথাই সংবাদে প্রকাশ হোক না কেন অনিল বসু শেষ পর্যন্ত কিছুই করে উঠতে পারবেন না। কারণ অনিল বসুকে হুগলী জেলা সিপিএমের একাংশ মোটেই সমর্থন করেন না। এমনকী হুগলীর জনগণের মধ্যেও অনিল বসুর কীর্তিকলাপের বেসুরো ছাপ পড়ে আছে। প্রসঙ্গত, ১৯৭৪ সালে পীযূষ দাশগুপ্ত, হরিনারায়ণ অধিকারী, সুধাংশু পালিত, হরিপদ মুখার্জী, কোলাঘাটের রাম পালদের 'লেনিন কেন্দ্র' কয়েকমাসের মধ্যেই বিলীন হয়ে গিয়েছিল। কারণটা স্পষ্ট। আজকের সিপিএমের বেশির ভাগ কর্মীই ক্ষমতার গুড় চাটতে চায়। কাজেই অনিল বসুরা যে ক্ষমতায় আসবে না— এটা স্বাভাবিক। তেমনি অনিল বসু নিজের অস্তিত্ব রক্ষার এক ব্যর্থ প্রয়াস চালাবেন।

সিপিএমের সামনে আর একটা যে বড় ধাক্কা এসেছে তা হলো দিনহাটা রিপোর্ট। এই রিপোর্টের ফলে ফরওয়ার্ড ব্লক এবং সিপিএমের সম্পর্কে চিড় ধরবেই। ফরওয়ার্ড ব্লকের নিচের তলার একাংশ বিপরীত শিবিরের অনুগামী হবেন।

সাম্প্রতিককালে সোমেন মিত্র জায়া তথা রাজ্যের বিধায়িকা শিখা মিত্র নাম না করে মমতার সমালোচনা করে বলেছেন--- 'স্তাবকতা' করতে পারবো না।' উল্লেখ করা যায় অতীতে সুদীপ-জায়া নয়নাও প্রায় এই ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন। মমতা সুদীপকে কোণঠাসা করার জন্য সাংবাদিক-সাংসদকে 'উত্তর কলকাতার গর্ব' বলে সভার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই 'সাংসদ সাংবাদিক'কে গ্লো-সাইনে ব্যাপক প্রচার করা হচ্ছে সুদীপ ব্যানার্জির নির্বাচনী এলাকায়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং কপিল সিবাল এরাজ্যে এসেছিলেন। তাঁদের আনার মূলে আছেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম্ বলেছেন— (১) মাও দমনে বিগত বাম সরকার কাজ করেছিল। (২) রাজ্যে যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ হচ্ছে তা উদ্বেগজনক। (৩) প্রণব মুখার্জি ৬৫ শতাংশ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিতবেন। এসব শুনে মমতার বক্তব্য কংগ্রেস সিপিএমের সঙ্গে গোপন আঁতাত করেছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চিদাম্বরমকে হুমকি দিয়ে চিঠিতে লিখেছেন 'রাজ্যের ব্যাপারে নাক গলাবেন না। ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস— অতীতে যখন বুদ্ধদেবকে চিদম্বরম সমালোচনা করে পত্রাঘাত করেছিলেন— তখন কিন্তু তদানীন্তন বিরোধী নেত্রী, বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্পর্কে আপ্লুত হয়েছিলেন এবং বারংবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নালিশ করেছিলেন। এখন সেটাই তো ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে। রাজনীতি হলো সমুদ্রের মতো যা ফেলবে তা দেরিতে হলেও ফিরে আসবেই। পুরীর সমুদ্রে তা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। মনে রাখতে হবে চিদাম্বরম সোনিয়া গান্ধীর একান্ত প্রিয়পাত্র।

মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী কপিল সিবাল বলেছেন যে রাজ্য সরকার বহু প্রকল্পের কেন্দ্রীয় বরাদ্দ অর্থ খরচ করতে না পারাতে ফেরত গেছে। যদিও এ রাজ্যের সরকার কেন্দ্র অর্থ দিচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলছে। মনে পড়ে যায় জ্যোতি বসুর আমলে বারবার কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা বলা হলে তখন কিন্তু কংগ্রেস এবং মমতাও বলতো যে নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে কেন্দ্রকে দোষারোপ করা হচ্ছে। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষী করেই কি রাজ্য সরকার নিজেদের ব্যর্থতাতে ঢাকতে পারবেন? তাইতো বামফ্রন্ট সরকারের বিগত বিভিন্ন কাজ সম্বন্ধে কমিশন বসানো হয়েছে। এ কথা হলফ করে বলা যায় বেশির ভাগ কমিশনের কাজ পাঁচ বছরের মধ্যে শেষ হবে। দিনহাটা কমিশনের রিপোর্ট পেশ করে ফরওয়ার্ড ব্লক-সিপিএমের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগানোর চেষ্টা মাত্র। এর সঙ্গে সঙ্গেই প্রাক্তন আবাসন মন্ত্রীর ফ্ল্যাট বিতরণ নিয়ে বর্তমান আবাসন মন্ত্রী বিধানসভায় তথ্য পেশ করেছেন। এর বিরুদ্ধে যথারীতি সরব হয়েছেন প্রাক্তন আবাসনমন্ত্রী। বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাঁর তীব্র আক্রমণাত্মক বক্তব্য রেখেছেন। তবে একথা ঠিকই সিপিএমের নেতা-মন্ত্রীরা নিজেদের ব্যবস্থা গুছিয়ে নিয়েছিলেন তলার কর্মীদের অবহেলা-বঞ্চনা করে। তাই এখন নিচের তলার কর্মীরা আর সক্রিয় হচ্ছেন না এবং হবেনও না। এই নেতারা থাকলে সিপিএম এ রাজ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

তোমার মেয়েরা ভালো নেই গো!

মাননীয়া
শ্রীশ্রী মা দুর্গা
কৈলাশধাম,

মাগো,

তোমার মেয়েরা ভাল নেই গো মা।

বর্ষা ডুব দিয়েছে। এবার আর বর্ষার ওপর ভরসা নেই। গ্রীষ্মের পরই শরতের প্রকৃতি। রেল লাইনের ধারে কাশ ফুল দুলছে। আকাশে পেঁজা পেঁজা মেঘ। কুমোরটুলিতে পুজো পুজো গন্ধ। পাড়ায় পাড়ায় খুঁটি পুজো সারা। তোমার অপেক্ষা শুরু হয়ে গেছে।

কিন্তু এসে কী করবে ভেবেছ? দশ হাতের দশ অস্ত্র দিয়ে অন্ধকার ঘুচবে না। তাই পারলে দু'টি হাত খালি করে চোখ চাপা দিও। তোমার আগমনে বাঙালি যে পুজোয় মাতে তাকে কখনও মাতৃ আরাধনা ভেব না যেন। ওটা আসলে তোমার নাম করে মোচ্ছব। মাতৃভক্তিই যদি থাকত, তবে সারা বছরই মাতৃশক্তির প্রতি পুজো না হোক, শ্রদ্ধাটুকু দেখা যেত।

কৈলাশে ভাগ্যিস খবরের কাগজের কোনও এডিশন নেই। তাই তোমাকে বঙ্গজননীর নিত্য বলাৎকার দেখতে হয় না। জানতে হয় না মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের বিচারে এ রাজ্য দেশের শীর্ষে। জানতে হয় না সেই সব অভিযোগের সুবিচার না দেওয়ার ক্ষেত্রেও এক নম্বরে এই বাংলা। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের রাজ্য দেশের আর সব রাজ্যকে পিছেনে এগিয়ে চলেছে এক অন্ধকারের দিকে।

সম্প্রতি জাতীয় ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে ২০০৬ সাল থেকে নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ দিন দিন বেড়েই চলেছে। গত বছরে সারা দেশে এমন অপরাধ যত ঘটেছে তার ১২.৭ শতাংশ এ রাজ্যের। দেশের মোট ধর্ষণের দশ শতাংশও পশ্চিমবঙ্গের। স্ত্রী নিগ্রহের ক্ষেত্রেও সবার ওপরে বাংলার নাম। সব কিছুই যখন বেশি বেশি তখন একটি বিষয়ে সব থেকে কম বাংলা। অপরাধীদের দোষ প্রমাণ করে শাস্তি পাওয়ার নজির সব থেকে কম সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে নিজের পিঠ চাপড়ানো পশ্চিমবঙ্গে।

জানি মা জানি, তুমি বলবে, 'কেন রে ব্যাটা, গতবারেই তো দেখে এলাম গোটা রাজ্যে মা-মাটি-মানুষের জয় জয়কার। এক মেয়েকে সিংহাসনে বসিয়ে পুজো করছে সবাই। তাহলে আবার ওকি রিপোর্টের কথা বলছিস!'

মা, আমি এও জানি যে তোমার সেই মেয়ে এসব শুনলে বলবে, 'এসব নারীর ওপর অত্যাচার বাম আমলের ব্যাপার। এখন ওসব কিছু হয় না। এই রিপোর্টের পিছনে ষড়যন্ত্র আছে।' কী ভাবছ? আমি তাঁর মনের কথা কী করে বুঝে ফেললাম? তুমি তো মা অন্তর্যামী। কিন্তু আমি তা নই। আমি বলছি পূর্ব অভিজ্ঞতায়। কয়েক মাস আগে যখন পার্ক স্ট্রিটে এক মহিলা তাঁর ওপর ধর্ষণের অভিযোগ তুললেন তখনই তোমার ওই মুখ্যমন্ত্রী মেয়ে বলেছিলেন, এটা ষড়যন্ত্র। আর তাঁর পারিষদরা ধর্ষণের ঘটনাকে চাপা দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। ধর্ষকের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার বদলে গলা ফাটিয়েছিলেন ধর্ষিতার 'সতীত্ব' নিয়ে প্রশ্ন তুলে। জানো মা এত চেঁচামেচির পর এখনও সেই কলঙ্ককাণ্ডের মূল পাণ্ডার টিকি ছুঁতে পারেনি পুলিশ। অথচ রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী তোমার সেই গর্বের মেয়েই গো!

আর এই আক্কেল না হওয়া রাজনীতির হাতের পুতুল প্রশাসন। ফলে দিন দিন মা দুর্গার বাংলায় ধর্ষণ বাড়ছে, নারী পাচার বাড়ছে, বধূ নির্যাতন বাড়ছে। দাম্পত্য হিংসার জেরে গায়ে আগুন, গলায় দড়ি বাড়ছে। এসবের বিচারে বাকি যা যা হয় সেসবকে অপরাধ বলেই মনে হয় না। রাস্তাঘাটে অশ্লীল অপমান, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি, কুপ্রস্তাব, জবরদস্তি তো আকছার ঘটছে। সব ঘটনা জানাও যায় না। ক্ষত বুকে চেপে কত মেয়ে বোবা হয়ে থাকে। নিজের ভিতরে গুমরে একা কাঁদে। বড় অশ্রুহীন।

ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য জানার পর এরাজ্যের মহিলা কমিশন বলেছে, এখানকার নারীরা সচেতন তাই থানায় গিয়ে অভিযোগ দাখিল করে। অন্য রাজ্যে এত অভিযোগ জমা পড়ে না। তাই সংখ্যার হিসেবে রাজ্য এগিয়ে। কিন্তু সচেতনতাই যদি এই পরিসংখ্যানের কারণ হয় তবে অপরাধীদের শাস্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের নাম সবার নীচে কেন? তবে কি প্রশাসনের, বিচারবিভাগের সচেতনতায় ঘাটতি পড়েছে? রাজনীতিকদের সংবেদশীলতা তলানিতে ঠেকেছে?

তাই বলি মা, এবার অস্ত্র বদলাও। কোন কালে মহিষাসুর বধ করা ওসব অস্তর-শস্তরে জং পড়ে গেছে। তাও যদি না পারো, তবে বছর বছর আসতে হবে না পুজোয়। থেকে যাও সন্তানদের বারোমাসের জীবনে। অস্ত্র ছেড়ে রুমাল নাও হাতে। কমপক্ষে চোখের জলটুকু তো মোছাতে পারবে।

—সুন্দর মৌলিক

বাস্তব প্রয়োজন ও বোধের অন্বেষণ

ডঃ স্বরূপ ঘোষ

হিলারি ক্লিনটন কলকাতায় এসেছিলেন। বহুদিন পর পশ্চিমবঙ্গে পা রাখলেন বিশ্বশক্তিধর দেশটির একজন ভারতপ্রেমিক নীতি নির্ধারক। আমাদেরও আবেগ ছেড়ে দাঁড়াতে হবে বাস্তবের মুখোমুখি। সুদীর্ঘকাল আন্দোলনমুখী হিন্দু বাঙ্গালী নিজেদের কমিউনিস্ট শক্তির দ্বারা পরিচালিত হতে দিয়েছে। তাতে অর্থনৈতিকভাবে আমাদের রাজ্য ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে। কলকাতা থেকে রাজধানী যখন দিল্লী চলে গেল আমরা আপ্লুত থাকলাম বঙ্গভঙ্গ রোধ করে। সে অখণ্ড বঙ্গের স্বপ্নও হলো সাময়িক। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ মূলতঃ বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশকেই বিভক্ত করল। আর অন্যান্য প্রদেশগুলি হয় ভারতে নয় তদানীন্তন পাকিস্তানে যোগদান করেছিল। প্রায় তাদের তখনকার সীমানা অক্ষুণ্ণ রেখে।

পাঞ্জাবীদের নিয়ে আমরা অনেক মজার গল্প করি আর নিজেদের তাঁদের থেকে বুদ্ধিমান ভেবে নিজেরাই আনন্দিত হই। কিন্তু পাঞ্জাবীরা ১৯৪৭ সালে জনবিনিময় সম্পন্ন করে নিজেদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করে নিয়েছে। দিল্লীর সংস্কৃতিতেও মূলতঃ পাঞ্জাবী সংস্কৃতির প্রভাবই প্রধান। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লী, যেখানে পাঞ্জাবী সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের থেকে অনেক এগিয়ে। আবেগ ছেড়ে নেহরুর অবাস্তব চিন্তার অনুসারী না হয়ে রাজনীতির উপরে উঠে পাঞ্জাব জনবিনিময় সম্পন্ন করেছিল। ভবিষ্যতের বিভীষিকা তাঁরা জীবন দিয়ে বুঝতে পেরেছিল।

আর আমরা বিশেষত কমিউনিস্ট মতের পক্ষে যাঁরা, তাঁদের নেতৃত্বের সিংহভাগই পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান, এঁদেরই জন্য পূর্ববঙ্গ হিন্দু গরিষ্ঠতা হারিয়েছে। পাঞ্জাব ও পশ্চিম ভারতকে পশ্চিম এশিয়ার মুসলমান আক্রমণের বর্বরতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গুরু অর্জুনকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। বীরের মতো লড়েছিলেন রণজিৎ সিংহজী ও রাণা প্রতাপ। আর এখানে লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে গেলেন, তাঁরও আগে রাজা গণেশের বংশধর মুসলমান হয়ে রাজ্য শাসন করলেন। জাতপাতের কথা বলে এখানে বাঙালি হিন্দুর উদাসীনতা ভুলে গেলে চলবে? জাতপাত সর্বভারতীয় চিত্র। তাহলে পার্শ্ববর্তী বিহার, ওড়িশা হিন্দু গরিষ্ঠতা হারাল না কেন? দিল্লীর নবাবদের শাসনের বহুকাছে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ হিন্দু প্রধান রইল কিভাবে?

আজ যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তাঁরা সিংহভাগই পূর্ববঙ্গীয় উচ্চবর্ণের হিন্দু যাঁদের পূর্বপুরুষদের সচেতনতার অভাবের জন্য সেদেশটাই হাতের বাইরে চলে গেল। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাব এপারের বাঙ্গালী হিন্দুকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এবার কমিউনিস্ট ও নিরীশ্বরবাদী শক্তি এ বঙ্গেও অনুপ্রবেশের বান ডেকে এনেছে। ভাসব আমরাও। কমিউনিস্ট সরকার গঙ্গার জল অবলীলাক্রমে দিয়ে দিল। ছিটমহলও চলে গেল। আমরা ঘুমিয়ে থেকে ভাবছি বেঁচে যাব! অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না। গুজরাট নিয়ে বিপ্লবী লেখা লিখে মুসলমানের জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন যে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীকুল বাংলাদেশের মুসলমানের অত্যাচারে হিন্দুর বিলুপ্ত হবার উপক্রম নিয়ে একটি শব্দও খরচা করতে দেখেছেন তাঁদের? গুজরাটে মুসলমান জনসংখ্যা ১০ শতাংশ ছিল নরেন্দ্র মোদী আসার আগে। আজও একইরকম। সামান্য বেড়েছে কিন্তু কমেনি। আর বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ২২ শতাংশ থেকে কমে ৮ শতাংশ হয়েছে কোথায় তখন বামপন্থী বিবেক? যাঁদের পূর্বপুরুষরা নিজেদের ভিটে মুসলমানের হাতে দিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, তাঁরা দেশত্যাগের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে দায়ী করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কমিউনিস্ট হলেন। এঁরা মূলতঃ চীনপন্থী। পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের চিত্ত কোনওদিনই ছিল না। ইউরোপের দর্শনে আকৃষ্ট ভারতবর্ষে তাঁদের কোন আদর্শগত টানও নেই।

জনগণনার তথ্য বলছে স্বাধীনতার সময়কার হিন্দু-মুসলমানের অনুপাত পরিবর্তন হয়ে গেছে বিভিন্ন জেলায়, মহকুমায়, গ্রামে, বিপদকে ঘরে ডেকে এনে দিয়ে গেছে তাঁরা। যে পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশকে স্বাধীনতা উত্তরকালে অনুদান দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে আর তার সঙ্গে আনুমানিক ৩ কোটি বাংলাদেশী মুসলমান অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে ভারতে প্রতিপালন করতে যে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে তার

দুর্নীতি আজ সর্বব্যাপী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশ সেবার নামে আত্ম-সমৃদ্ধিই মূল হয়েছে। ত্যাগের আসনে ভোগ এসে বসেছে। এ থেকে মুক্তির রাস্তা একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের বৈদান্তিক সমাজতন্ত্র। জাতীয়তাবাদী শক্তিকে এ তত্ত্বে আস্থা রেখে এগিয়ে আসতে হবে ভবিষ্যতে। অতীতে আমরা স্বামীজীর দর্শন মানলে চীনের পিছনে নয়, সামনে থাকতাম।

চেয়ে বাংলাদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দু জনবিনিময়ের মাধ্যমে ভারতে এলে পাঞ্জাবের ন্যায় উদ্বাস্তু সাহায্য দিয়ে হিন্দু বাঙ্গালীর জাতিগত সুরক্ষাকে অনেক বেশী সংগঠিত করা যেত। এর সঙ্গে পাঞ্জাবের মতো উদ্বাস্তু সমস্যাও চিরকালের মতো পশ্চিমবঙ্গেও অনেকটা মেটানো সম্ভব হোত।

রাজনৈতিক স্বার্থে কমিউনিস্টরা উদ্বাস্তুদের নিয়ে নিজেদের ক্ষমতার জন্য ব্যবহার করেছে। আর নেহরুর চিরকালীন হিন্দু বাঙ্গালী বিদ্বেষ ও সুভাষচন্দ্রের প্রতি অনুরাগহীনতা একাকার হয়ে গেছে। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান নিয়ে পরের পর কংগ্রেস সরকারের ভূমিকা মানুষের কাছে এঁদের চরিত্রকে প্রকাশ করে দিয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের দর্শন মেনে বাংলাদেশের সঙ্গে জনবিনিময় করে সমস্যা মেটাতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় থাকুক কিন্তু ভারত প্রতিপত্তিশালী প্রতিবেশী এটা বাংলাদেশকে বুঝিয়ে জনবিনিময়ের ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে একদিন জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দিয়ে সরকারকে সামনের দিকে নিয়ে আসতে বাধ্য করতে হবে। নাহলে ভাসবে সমগ্র পূর্ব ভারত।

চীনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে সামনে এনে অনেক সময় কমিউনিস্ট শক্তি প্রচার করে ভারতবর্ষে চীনের ন্যায় একদলীয় শাসন ব্যবস্থা নেই। তবুও চীনে যদি বিপ্লবের পর কমিউনিস্ট পার্টিই ৬২ বছর সময় পেয়ে থাকে ভারতবর্ষে নেহরুবংশের প্রতিনিধিরা ও তাঁদের পারিবারিক স্নেহধন্য কংগ্রেস(ই) বহু বছর সময় পেয়েছে। নেহরুবংশ প্রত্যক্ষ ও কংগ্রেস পরোক্ষভাবে প্রায় ৫৪ বছর দেশ শাসন করেছে। তাই চীনে কমিউনিস্টরা যেটা পেরেছে নেহরু বংশ পারেনি কারণ তাঁরা স্বাধীনতার পর ভোগবাদকে যেভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন তাতে দুর্নীতি আজ সর্বব্যাপী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশ-সেবার নামে আত্ম-সমৃদ্ধিই মূল হয়েছে। ত্যাগের আসনে ভোগ এসে বসেছে। এ থেকে মুক্তির রাস্তা একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের বৈদান্তিক সমাজতন্ত্র। জাতীয়তাবাদী শক্তিকে এ তত্ত্বে আস্থা রেখে এগিয়ে আসতে হবে ভবিষ্যতে। অতীতে আমরা স্বামীজীর দর্শন মানলে চীনের পিছনে নয়, সামনে থাকতাম।

অধ্যাত্মবাদী রাষ্ট্রবাদীরাই রাষ্ট্রনীতিকে বোধের উপর ত্যাগের মন্ত্রে বাঁধতে পারবে। বিদেশনীতি তারই অঙ্গ। স্বাধীনতার পর বিদেশনীতি ভাববাদের উপর ও নেহরু শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাবেন এই আশায় রচনা হলো। ইজরায়েলকে ব্রাত্য করে রাখা হলো বহুকাল। এদিকে ইহুদি জাতি আমাদের হিন্দু জাতির মতো প্রচুর অত্যাচার সহ্য করেছে। আমেরিকার নীতিনির্ধারণে ইহুদি সমাজের ভূমিকা অসীম। তাই ভারতের ইজরায়েলকে যথার্থ গুরুত্ব দেবার সময় এসেছে। এছাড়াও আমরা বিশ্বরাজনীতিতে হিন্দু-বৌদ্ধ ঐক্যের যে স্বপ্ন স্বামীজী দেখেছিলেন সে পথে গেলাম না স্বাধীনতা উত্তরকালে।

প্রাচীন ধর্মমতগুলি যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি ও প্রাচীন আফ্রিকান ধর্ম পালন করে এমন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে Religious Co-operation গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল। তাহলে Pan-Islamic Fundamentalism আজ আমাদের এভাবে বিব্রত করতে পারত না। European Union এর পথে Christian Religio-Cultural Consciousness-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পশ্চিমী দেশগুলি থেকে চার্চের হাতে যে পরিমাণ অর্থ আসে ও ধর্মান্তরিত করার কাজে যেভাবে ব্যবহার করা হয় উত্তর-পূর্ব ভারত তার উজ্জ্বল প্রমাণ। বর্তমানে দক্ষিণ ভারতেও এ প্রক্রিয়া চলছে বেশ ভালোভাবে। মধ্যপ্রাচ্য থেকেও অর্থ আসে এ সত্য অজানা নয় এবং মসজিদ, মাদ্রাসা তাতে সমৃদ্ধ হয় তাও সকলে জানে। Oriental Religio-Cultural Unity গড়ে তোলা আশু প্রয়োজন। তেল নিয়ে বিশ্ব রাজনীতি Pan-Islamic দেশগুলির ভূমিকাই প্রধান। সারা পৃথিবীর পটভূমিকায় খৃস্টান জনসংখ্যা ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশের মধ্যে। মুসলমান জনসংখ্যা ১৮ থেকে ২২ শতাংশের মধ্যে। হিন্দুর জনসংখ্যা ১৩ থেকে ১৫ শতাংশের মধ্যে ও বৌদ্ধ জনসংখ্যা ৬ থেকে ৮ শতাংশের মধ্যে। শিখ, জৈন, আদি আফ্রিকান ধর্ম, ইহুদি ধর্ম, প্রাচীন চীনের ধর্ম এগুলিকে মেলালে এঁদের জনসংখ্যা প্রায় ১৩ থেকে ১৫ শতাংশের মধ্যে। তাই হিন্দু, বৌদ্ধ ও প্রাচীন আফ্রিকার ও চীনের ধর্ম, ইহুদি ধর্মকে সঙ্গে নিয়ে Oriental Unity গঠন করতে হবে। পৃথিবীর প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ শতংশ মানুষ তাঁদের খৃস্টপূর্ব পিতৃপূর্বপুরুষের ধর্ম পালন করেন। শিখ, জৈন ধর্ম পালনকারী মানুষ ভারতীয় সংবিধান অনুসারেই হিন্দুর বৃহত্তর সমাজের অঙ্গীভূত। বিশ্বের প্রায় ২৩টি দেশে এই Oriental Religion মান্যকারী মানুষই সংখ্যাগুরু। আর প্রায় ১৫টির মতো দেশে তাঁদের জনসংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ১০ থেকে ৪০ শতাংশের মধ্যে। এঁরা এক সংগঠিতরূপে বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হলে পরে Pan-Islamic আচরণের যোগ্য জবাব দিতে পারবেন। চীন ও সংগঠিত Oriental World-কে অস্বীকার করতে পারবে না ব্যবসার স্বার্থে। বর্তমানে ভারত বিরোধী প্রতিবেশীদের যেভাবে চীন পরোক্ষভাবে সাহায্য করছে সে রাস্তা থেকে তাঁকে সরিয়ে আনতে গেলে ঐক্যবদ্ধ Oriental Bloc প্রয়োজন। স্বামীজী বহুদিন পূর্বেই হিন্দু- বৌদ্ধ ঐক্যের কথা বলেছিলেন আমরা তাঁকে মান্য করিনি আজ সেই পথ ধরে এগিয়ে যাবার দিন এসেছে। বিশ্বের অর্থনীতিতে এশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারত, চীন, জাপানের প্রতিপত্তি বিশ্বের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বাড়তে বাধ্য, সেখানে চীনের সংস্কৃতির টান Orient-এর দিকে। দৃঢ় শক্তিশালী Oriental Bloc এর সঙ্গে বৈরিতা তাঁর অর্থনৈতিক ক্ষতি ও সংস্কৃতিক নিঃসঙ্গতা ডেকে আনবে। তাই চীন তখন বাধ্য হবে Oriental Bloc-এর সঙ্গে ক্রিয়াশীল মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে। আর এই Oriental Unity-র প্রাণকেন্দ্রে থাকবে হিন্দু-বৌদ্ধ ঐক্য।

স্বামীজী বলেছিলেন, ''If China, or Japan, or Ceylon follow the teachings of the Great Master [Buddha], India worships him as god incarnate on earth... The relation between Hinduism (by Hinduism, I mean the religion of the Vedas) and what is called Buddhism at present day is nearly the same as between Judaism and Christianity. Jesus Christ was a Jew, and Shakya Muni was a Hindu. The Jews rejected Jesus Christ, may, Crucified him, and the Hindus have accepted Shakya Muni as God and worship him... I repeat, Shakya Muni came not to destroy, but he was the fulfilment, the logical conclusion, the logical development of the religion of the Hindus.'' ▯

জল প্রাকৃতিক সম্পদ : দেশবাসীকে নিঃশুল্ক যোগান দিতে সরকার বাধ্য

বাসুদেব পাল

জল হলো মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই বিশেষ উপাদানকে কারও একচেটিয়া অধিকারে নিয়ে অথবা ব্যবসায়ীকরণের ধারণাটাই মানবকল্যাণের বিপরীত। যে পদ্ধতি বা মানসিকতা মানবকল্যাণরহিত তা কখনই রাষ্ট্রের পক্ষে লাভদায়ক হতে পারে না। জলসম্পদ সংরক্ষণের নামে জীবনযাত্রার এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে ব্যবসায়ী-করণের সরকারি প্রয়াসকে 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি'-তে রূপান্তরিত করার দিকেই সংকেত করে। বন্টন এবং দেখভাল করার নামে সার্বজনিকভাবে স্বকীয় সহায়তা (পি পি পি মডেল)-র আদলে আনার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। নীতি প্রণেতাদেরকে এই দুমুখো নীতি খোলসা করতে হবে এবং তা বন্ধ করতে হবে। এজন্য সারা দেশ জুড়েই জনজাগরণ এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে।

বিশ্বব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংস্থার চাপ

স্বাধীনতা (১৯৪৭)-র পর ছয় দশক বাদেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন সরকার নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। এক্ষেত্রে যে সব কাজ করার দরকার ছিল বা ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল তা না করে সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থার দ্বারস্থ হওয়ার পক্ষে যুক্তি-তর্ক দিতে শুরু করে। বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, ডব্লিউ টি ও প্রভৃতি সংস্থা চুক্তি করে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের বাজারকে কব্জা করার জন্য সরকারগুলোকে উৎসাহিত করতে থাকে। এই বিরাট বাজার হাতে গোনা কয়েকটি উন্নত দেশের মুনাফা কামানোর লক্ষ্যে পর্যবসিত হয়।

১৯৯০-এর শুরু থেকেই উন্নয়নশীল দেশে নীতিগত কাঠামোর পরিবর্তন ওইসব দেশের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সুযোগ করে দেয় আর পশ্চিমী দেশগুলোর বিবিধ কোম্পানীর বাজার খোঁজার বাসনা বাস্তবায়িত হয়। তখন তারা নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক ঋণদানের শর্ত হিসেবে সবাইকে সমান সুযোগ দানের নামে বিদেশী বহুজাতিক এবং ব্যক্তিগত কোম্পানীগুলোর জন্য সুযোগ দেওয়ার দাবী করতে থাকে।

একথা বলতে কোনও দ্বিধা নেই যে, পর্যাপ্ত পরিমাণে দেশের নাগরিকদের পরিস্রুত পানীয় জল প্রদানে বিফলতা ভারতের সংবিধানের ২১নং ধারায় প্রদত্ত জীবনযাপন করার মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকারের উল্লঙ্ঘন বা হনন। এজন্য সরকারকে অন্যান্য উন্নয়নের কাজ বাদ দিয়েও স্বচ্ছ পানীয় জল প্রদানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক্ষেত্রে টাকার অভাব অথবা পরিকাঠামোর অভাব— এসকল অজুহাত চলবে না।

এক সমীক্ষা অনুসারে ২০০০ সালেই আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের প্রদত্ত ঋণের বারোটি শর্তের শেষটিতে 'জল' আপূর্তিতে আংশিক অথবা সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণ, ভর্তুকী সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। ২০০১-এ বিশ্বব্যাঙ্ক জল আপূর্তি ও স্বচ্ছতার জন্য ঋণ দেওয়ার শর্ত হিসেবে জল প্রদানের ব্যবস্থার কম করে চল্লিশ ভাগ ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের অনিবার্যতা আরোপ করে।

বিষয়ের জটিলতা এবং গুরুত্ব বিবেচনা করে বর্তমানে সরকার অনেকরকম আইনকানুন প্রচলন করছেন। শহর, মহানগর এবং রাজ্যে- রাজ্যে জল সরবরাহের জন্য জলবোর্ড গঠন, মাটির নীচেকার জল তোলার জন্য এবং জলসম্পদ সংরক্ষণের জন্য আইন, কারখানায় জল সরবরাহের জন্য আইন প্রভৃতি বিষয়ে।

জাতীয় জলনীতি ২০১২-র খসড়াতে ওইসব বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। তুলনাত্মক আলোচনা করলেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় কীভাবে জলসরবরাহের বিষয়টাকে বাজারীকরণ বা বাজারব্যবস্থার মধ্যে ঢোকানো হয়েছে। ফলে গরীব ও দুর্বল লোকেদের পক্ষে দাম দিয়ে জলপান কষ্টকর হতে পারে। জলের জন্য বিত্তবানরা যে দাম দিতে পারে তা প্রান্তিক ও সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বলা দরকার সরকার জনকল্যাণ করার যে শপথ নেন তা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন।

আম-আদমীর দুরবস্থা

সমাজে দুটি শ্রেণীর মানুষ

রয়েছেন যাঁরা নীতি নির্ধারণ আর তা কার্যকর করতে প্রভাবী ভূমিকা পালন করে থাকেন। প্রভাব বিস্তার করেন। এরা সবকিছুকেই কিনে নিতে পারেন। প্রচলিত দামের চেয়ে বেশি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। ওদের ব্যবসায়িক ধরনটাই হলো কোনও একটা জিনিসের সংকট (অমিল) তৈরি করে তাকে নিয়ে চুটিয়ে ব্যবসা আর বেশি করে অর্থ উপার্জন। যদিও আমরা মানি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা সঞ্চয়ের প্রেরণা হলো 'নিজস্ব মালিকানা।' তা সত্ত্বেও সর্বসাধারণ প্রাথমিক কথাই হলো অপরের অর্থাৎ 'সাধারণ মানুষ'-এর জন্য, যারা উন্নয়নের পথে পিছিয়ে পড়েছে।

জলের 'বেসরকারিকরণ'-এর বড় কারণ হলো বেসরকারি ক্ষেত্রের ব্যাপক প্রভাব। বেসরকারি ক্ষেত্রের দাপটকে মেনে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে— কৌশল এবং প্রভুত্বের মধ্যে কোনও পারস্পরিক

(সাব কমিটি) বলেছে, জলের বার্ষিক চাহিদা ১,০৯৩ আরব ঘনমিটার। সংযুক্ত জলসম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় কমিশন বলেছে— ২০৫০ সাল পর্যন্ত জলের মোট চাহিদা কম হলে ৯৭৬ আরব ঘনমিটার আর সর্বাপেক্ষা বেশি হলে ১,১৮০ আরব ঘনমিটার হবে। এরকমই অনুমান। যারা জলকে বেসরকারিকরণ করার পক্ষে ওকালতি করছেন, তারা নানারকম যুক্তি-তর্ক দেখাচ্ছেন।

আদালতের নির্দেশ

বাতাসের মতোই জলও প্রকৃতি কর্তৃক নিঃশুল্ক প্রদত্ত। মানবজাতি লক্ষ লক্ষ বছর যাবৎ বিনা ট্যাক্সেই তার ব্যবহার করে আসছে। সুপ্রীম কোর্ট ১৯৯৭ সালে এম সি মেহতা বনাম কমলনাথ (বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) মামলার রায়ে বলেছিলেন— ''সরকার যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের অছি (ট্রাস্টি) মাত্র। সেই ট্রাস্টির

২১নং ধারায় প্রদত্ত জীবনযাপন করার মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকারের উল্লঙ্ঘন বা হনন। এজন্য সরকারকে অন্যান্য উন্নয়নের কাজ বাদ দিয়েও স্বচ্ছ পানীয় জল প্রদানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক্ষেত্রে টাকার অভাব অথবা পরিকাঠামোর অভাব— এসকল অজুহাত চলবে না। সমাজের পরিকাঠামো এমনটাই হতে হবে যে, জাত-পাত, পন্থ-সম্প্রদায় অথবা ধনী-নির্ধন ব্যতিরেকে ভেদাভেদ ছাড়াই সকলের সহকারিতা বা অংশগ্রহণের কথা মনে রাখতে হবে। সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন মেটানো সরকারের শুধু দায়িত্ব নয় বাধ্যবাধকতা। এই দায়িত্বের কথা এই সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, পন্থনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের স্বীকৃত সংবিধানে বর্ণিত হয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়টি সর্বসমক্ষে নিয়ে আসার জন্য, সুষ্ঠু আলোচনার জন্য, 'জলাধিকার' বিষয়ে সেমিনার প্রভৃতির মাধ্যমে সাধারণ জনতাকে সজাগ করে তুলতে হবে। জোর গলায় দাবী

	জাতীয় জলনীতি-১৯৮৭	জাতীয় জলনীতি-২০০২	জাতীয় জলনীতি-২০১২
পানীয় জল	১৯৯১ সাল সকল জনগণকে প্রদান করা হবে।	কোনও উল্লেখ নেই।	কোনও উল্লেখ নেই।
ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের ভূমিকা	পরিচালনা, দেখা-শোনা, খরচ তোলার কোনও উল্লেখ নেই	পুঁজি বিনিয়োগ এবং দেখাশোনা করার জন্য খরচ তুলে নেবার কথা বলা হয়েছে।	বিনিয়োগ বাবদ খরচ পুরো তুলে নেবার উল্লেখ করা হয়েছে।
স্বায়ত্তাধীন জলবোর্ড	কোনও উল্লেখ নেই।	কোনও উল্লেখ নেই।	উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্বন্ধ নেই। এর অনেক উদাহরণ আছে। সরকারও বেসরকারি ক্ষেত্রের সমান ক্ষমতা ধরে। 'জল' এমন একটি বিষয় যা প্রকৃতি প্রদত্ত এবং একচেটিয়া প্রাকৃতিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। অদূর ভবিষ্যতে এমনও হতে পারে যে, জলকে নীলামে চড়িয়ে সর্বোচ্চ মূল্যদাতাকে তা দিয়ে দেওয়া হতে পারে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো— জলের উপলব্ধতা আর চাহিদার সরকারি তথ্যের বাস্তবতা এবং অনুমান মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, সব মিলিয়ে কোথাও কোনও কমতি বা ঘাটতি নেই।

জলের যোগান বিষয়ে ভুল ধারণা

স্থানীয়ভাবে 'জলাভাব'-ই জলের পরিমাণ ও যোগান নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করে। একটা কথা সকলের পরিষ্কারভাবে জেনে রাখা ভালো যে, দেশে জলের কোনও অভাব নেই। কেন্দ্রীয় জল নিগম-এর হিসেবমতো 'জল-সম্পদ'-এর আনুমানিক উপযোগিতা ১,১২৩ আরব ঘন মিটার। জল-সম্পদ মন্ত্রকের স্থায়ী উপসমিতি

সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করে হাওয়া, সমুদ্র, জল এবং জঙ্গলের মতো নিশ্চিত সম্পদ সকল মানবজাতির জন্য এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এসকলকে ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত করা সম্পূর্ণভাবে অনুচিত। যা কিছুই প্রকৃতি-প্রদত্ত উপহার বা দান স্বরূপ তাকে যে কাউকে নিঃশুল্ক প্রদান করতে হবে। এই রায়কে কার্যকর করার জন্য সরকার সাধারণ মানুষের কল্যাণে এসব প্রাকৃতিক সম্পদকে যেন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অথবা ব্যবসায়ীকরণ করতে অনুমতি না দেন।'' কোকাকোলা-মামলায় (১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩) কেরল হাইকোর্ট তার রায়ে বলেছেন--- ''সরকারের কাছে ব্যবস্থাদি নিয়ন্ত্রণের নামে জল অথবা অন্য কোনও প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না।''

একথা বলতে কোনও দ্বিধা নেই যে, পর্যাপ্ত পরিমাণে দেশের নাগরিকদের পরিস্রুত পানীয় জল প্রদানে বিফলতা ভারতের সংবিধানের

করতে হবে--- সংবিধানের ২১নং ধারায় জীবনযাপনের অধিকারকে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। নাগরিকদের স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ পানীয় জল যোগান দেওয়া সরকারের দায়িত্ব। সম্প্রতি ভারত সরকারের পেশ করা জাতীয় জলনীতির খসড়ায় জলের বেসরকারীকরণকে রুখতে হবে। ওই নীতি সরকারের অছি (ট্রাস্টি)- সুলভ অবধারণার বিরোধী এবং গরীব-বিরোধী।

এর সঙ্গে পুকুর, দীঘি, বাঁধ প্রভৃতি পরম্পরাগতভাবে জল সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করে একীকৃত 'জলসম্পদ' বিনিয়োগের নীতি গ্রহণ করতে হবে। এবছর (মার্চ-২০১২) রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিসভার বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে 'জাতীয় জলনীতি-২০১২'-কে দেশহিত এবং জনকল্যাণ-বিরোধী বলা হয়েছে। একইসঙ্গে এই নীতির প্রতিরোধে সজ্ঞ জনজাগরণ করার এবং সম্পূর্ণ সমাজকে বিরোধিতা করার আহ্বান জানিয়েছে। □

জাতীয় জলনীতির খসড়া প্রস্তাব '১২-য় জোর জলের বাণিজ্যিকীকরণেই

তারক সাহা

জলের অপর নাম জীবন। নাগরিক জীবনে জলের অপরিহার্যতা স্বীকার করে কেন্দ্রীয় জল-সম্পদ মন্ত্রক জাতীয় জলনীতি (২০১২) যে খসড়া প্রস্তাব করেছে তাতে জলের বাণিজ্যিকীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে তারই বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিনিধি সভা যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তারই প্রেক্ষিতে এই প্রতিবেদন।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার সিদ্ধান্ত হলো জনস্বার্থে জলসম্পদ, ভূমি, বায়ু, খনিজ সম্পদ, প্রাণী সম্পদ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বস্তু কখনও-ই বাণিজ্যিক বস্তু হতে পারে না। আমাদের নীতি হলো এইসব সামগ্রীর ব্যবহার, সুসমঞ্জস রক্ষণাবেক্ষণ করতে সকলের ব্যবহারের জন্য। অথচ সরকার জলের মতো অত্যাবশ্যক পানীয়ের বাণিজ্যিকীকরণ করতে শুধুমাত্র এই বলে যে, ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ দুনিয়ায় ১৭ শতাংশ মানুষের বাস মাত্র ২.৫ শতাংশ জমিতে এবং মাত্র ৪ শতাংশ পরিস্রুত জল সম্পদ— এই অজুহাতে সরকার চাইছে জলের নিয়ন্ত্রণ বে-সরকারি বহুজাতিক সংস্থার হাতে তুলে দিতে চাইছে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। প্রতিনিধি সভা এরই বিরুদ্ধে সরব। কী বলছে সরকারি খসড়া প্রস্তাব? সরকারের প্রস্তাবে বলা হচ্ছে :

সারাদেশের বাস্তবচিত্র হলো যে, (১) বর্ধিত জনসংখ্যার চাপে দেশ জুড়ে জল সরবরাহের ওপর চাপ রয়েছে। শুধু তাই দ্রুত নগরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনধারার পরিবর্তন হচ্ছে এবং এমনই পরিবর্তন জল সম্পদের ওপর চাপ ক্রমাগত বাড়াচ্ছে। (২) জলবায়ুর বদলের সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে বন্যা, ভূমিক্ষয় প্রভৃতি ঘটনাসমূহ জলকে আরও বেশী দুষ্প্রাপ্য করে তুলছে, (৩) জলবায়ুর পরিবর্তন সমুদ্রের সমুদ্রের উচ্চতা বাড়াচ্ছে, জলে লবণের পরিমাণ বাড়ছে স্থলভাগের জলসম্পদ এবং এই অনাহুত সমস্যার জেরে বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে, (৪) পরিস্রুত জলের চাহিদা বাড়তে থাকায় পানীয় জলের অসম বন্টন সমস্যা ঘটাচ্ছে বিভিন্ন স্থানে। (৫) ভূগর্ভস্থ জল ও তার বন্টন আজও ব্যক্তিগত মালিকানায় অধীন। নির্বিচারে এর ব্যবহার সমস্যা তৈরী করছে, (৬) জল সম্পদের বিভিন্ন পরিকল্পনা বহুমুখী এবং এই পরিকল্পনায় সঙ্গে যুক্ত বহু সংস্থাকে নিয়ে সরকারি পরিকল্পনা সরকার বাস্তবায়িত করায় চিন্তা-ভাবনা করছে যাতে সুসংহত ভাবে জনতার সুবিধার্থে তা বন্টনে সরকার সচেষ্ট, (৭) আন্তঃরাজ্য জলের আবন্টন ব্যবস্থা নিয়ে বিবাদ জলের ব্যবহারের ওপর প্রভাব ফেলছে, (৮) বর্তমানে জলের যে সম্পদ রয়েছে এবং পরিকাঠামোয় সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না পরিণামে জলের সদর্থক ব্যবহার হচ্ছে না, (৯) বর্ধিত জনসংখ্যা পরিস্রুত জল ব্যবহারের অন্তরায় এবং সামগ্রিক ভাবে তা স্বাস্থ্যব্যবস্থায় প্রভাব ফেলছে, (১০) প্রশিক্ষিত মানুষের অভাব রয়েছে বৈজ্ঞানিক ভাবে জলের ব্যবহার ও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় না কীভাবে জলের অপচয় বন্ধ করা যায়। পরিস্রুত জলের সদ্ব্যবহারের উপায় সাধারণ মানুষকে অবগত করা যাচ্ছে না।

পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে গিয়ে যে ব্যয় সরকার করবে তা পূরণে জনগণের কাছ থেকে সেই খরচ উসুল করার কথাও বলা হয়েছে ওই প্রস্তাবে। এতে বলা হচ্ছে জনজীবনে ও পরিবেশ সুরক্ষায় জল সরবরাহে সরকার যে খরচ করবে তা জনগণের কাছ থেকে তুলবে আর অন্য যে সব পরিষেবা সরকার দেয় তাদের মতোই।

খসড়া কেন্দ্রীয় প্রস্তাবে রাজ্যগুলিকে জলসংক্রান্ত বিষয়ে ঢালাও অধিকার দেওয়া হয়েছে আইন তৈরী করার। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করবে। সরকার এই বিষয়ে স্থানীয় স্তরে জলের জন্য সংস্থা গড়ার কথা বলা হয়েছে, যে

সংস্থা জলের সঠিক ব্যবহারের জন্য মানুষকে পরামর্শ দেবে।

কিন্তু এইসব পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে গিয়ে যে ব্যয় সরকার করবে তা পূরণে জনগণের কাছ থেকে সেই খরচ উসুল করার কথাও বলা হয়েছে ওই প্রস্তাবে। এতে বলা হচ্ছে জনজীবনে ও পরিবেশ সুরক্ষায় জল সরবরাহে সরকার যে খরচ করবে তা জনগণের কাছ থেকে তুলবে আর অন্য যে সব পরিষেবা সরকার দেয় তাদের মতোই। সরকার জল ব্যবহারের জন্য যে শুল্ক বা কর ধার্য করবে তা আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে জল ব্যবহারকারী সংগঠনের ওপর। অর্থাৎ এতদিন সাধারণ মানুষ নিঃশুল্ক জল পেয়ে আসছিল তা আর বিনা পয়সায় পাবে না সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ সরকার জলের বাণিজ্যিকীকরণের ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করে দেবার পরিকল্পনা নিচ্ছে যা ন্যস্ত হবে যে সরকারি সংস্থার হাতে।

সরকারি এই খসড়া প্রস্তাবে একটা ভালোদিকও রয়েছে। বাড়তি জনসংখ্যার চাপে নদীর কূল, জলাশয়গুলি ক্রমশ দূষিত হয়ে পড়ছে। এই খসড়া প্রস্তাবে জল সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। জলাশয়গুলির গতিপথগুলির পরিবর্তন হচ্ছে সেইসঙ্গে দূষণের ফলে জলাশয়গুলির স্বাভাবিক গতিতে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে বিশেষতঃ চাষবাস বা শহরের পয়ঃপ্রণালী যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য। সরকার দূষণ রুখতে দূষণকারীদের ওপর চড়াহারে জরিমানার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জলসম্পদ সংরক্ষণের জন্য পরিকাঠামোয় লব্ধ জরিমানার অর্থ খরচ করা হবে। জলসম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে গিয়ে সরকার যে বাঁধ নির্মাণ করবে তাতে কিছু মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে এবং তাদের এই সংরক্ষণের প্রোজেক্ট-এর সঙ্গে অঙ্গীভূত করে তাদের ক্ষতিপূরণ করবে সরকার। এই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে গিয়ে সরকারের ব্যয় পূরণ হবে জলের ব্যবহারকারীদের ওপর শুল্ক বাড়িয়ে। জলের মতো অপরিহার্য এই তরলের ওপর কর বসানো বা সরকার যেভাবে এই বিষয়ে বে-সরকারিকরণের কথা ভাবছে তা আগামীদিনে ভয়াবহরূপ নেবে আর এই আশঙ্কায় শঙ্কিত অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা। আর এ ধরনের ব্যবস্থা গৃহীত হলে সরকার ব্যাপকভাবে গণরোষের মুখে পড়বে বলে সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছে প্রতিনিধি সভা।

জল সরবরাহ ও স্বচ্ছতা বিষয়ে সরকার সচেতনভাবে গ্রামীণ ও শহর এই দুইভাবে বিভক্ত করেছে সমস্ত বিষয়কে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে মানুষের কাছে পরিস্রুত জল ও তৎসহ পয়ঃপ্রণালী নিকাশী ব্যবস্থা জোরদার করার প্রয়াসের কথা বলা হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জল পাইপের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের কাছে ক্লোরাইড, ক্লোরাইডমুক্ত সরবরাহের কথা বলা হয়েছে খসড়ায়।

শহরে জল সরবরাহের ক্ষেত্রে জমির ওপরের জলের অধিকতর ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। শিল্পক্ষেত্র থেকে নির্গত জল এবং রান্নাঘরের ব্যবহৃত জলের স্থানীয় পরিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে পুনর্ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। শহরে এই পরিস্রুত জল সরবরাহের যে ব্যবস্থা সরকার করবে তা আদৌ নিঃশুল্ক হবে না বলে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে। এর মাশুল অবশ্যই গুনতে হবে সাধারণ মানুষকে। জলের মতো এমন অপরিহার্য গণ্য বাণিজ্যিকীকরণের তালিকাভুক্ত করার সরকারি প্রচেষ্টা অবশ্যই উদ্বেগের কারণ। তাই এই চক্রান্তের প্রতি সর্বান্তঃকরণে উষ্মা ব্যক্ত করেছে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা। ▯

নেত্রদান মহাদান

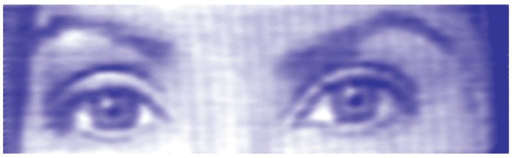

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান : 22181995, 22180387

সৌজন্যে : কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

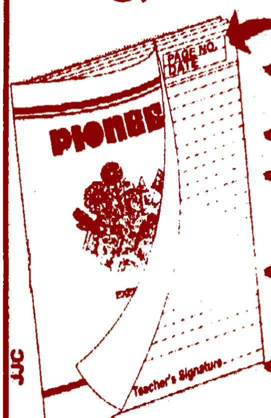

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature.................... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

কলকাতার টালা ট্যাঙ্ক

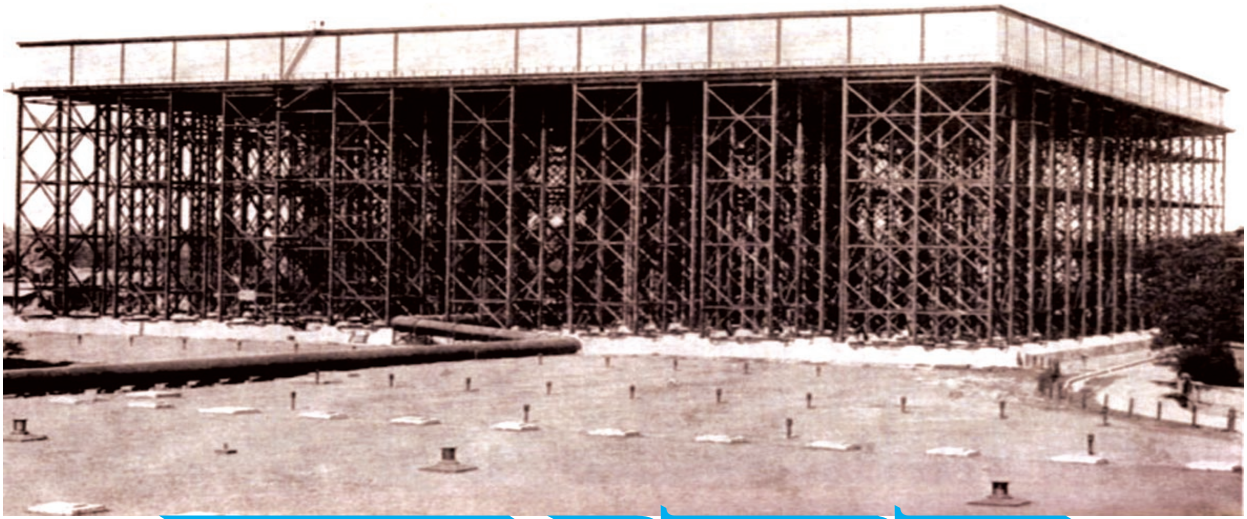

জলের সাতকাহন

শংকর পাল

২০০৭ সালের ২ জানুয়ারি কলকাতার নিমতলাঘাটে কাশীর গঙ্গা মহাসভার উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় এসময়কার ভারতবর্ষের স্বনামধন্য সন্ত, মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী অবধেশানন্দ গিরি মহারাজ বক্তব্য রাখছিলেন। গঙ্গানদীর ধারাকে অবিরল নির্মল রাখা এবং গঙ্গানদীকে বিভিন্ন প্রদূষণ থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে গঙ্গাসাগর থেকে গোমুখ পর্যন্ত ওই যাত্রা, জনজাগরণের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল। বক্তব্য প্রসঙ্গে স্বামী অবধেশানন্দ মহারাজ অনেকগুলি বিষয় উত্থাপন করেছিলেন। তার মধ্যে জলকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন— 'আজ (২০০৭) পৃথিবীতে বোতলবন্দী জলের বাণিজ্য প্রায় ৩২ বিলিয়ন ডলার'। বর্তমানে তা আরও অনেকগুণ বেশি। কল্পনারও বাইরে। বিবিসি-র ভাষ্য অনুযায়ী বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের দৌলতে ১৯৮০ সালেই বোতল ব্যবহৃত হয়েছিল ১২ মিলিয়ন। ওই দশকের শেষেই তা বেড়ে ১৫২ মিলিয়ন হয়। এক মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ।

বিভিন্ন কোম্পানীর চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন, প্রচার প্রভৃতির ফলে উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তরাই নন, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও বোতলবন্দী পানীয় জলের প্রতি আকর্ষণ নিত্য নিয়মিত বেড়ে চলেছে। প্রকৃতি প্রদত্ত জলই বাণিজ্যিক ও লাভদায়ক পণ্যে পরিণত হচ্ছে। নিত্যনতুন ব্রান্ড নামে বোতলবন্দী জল বাজারে আসছে। ১৯৮০-র দশকেও ভারতবর্ষে ছোট-বড় প্রায় সব রেলস্টেশনে জলের জালা ও মগ রাখা থাকত। গ্রীষ্মকালে রেলস্টেশনে রেলের উদ্যোগে বড় হাতলযুক্ত মগ বা গ্লাসে যাত্রীদের জল পান করানোর বন্দোবস্ত ছিল। তখন কোকাকোলা কোম্পানীকে মোরারজী সরকার (১৯৭৭) ভারত থেকে বিতাড়িত করেছিল। নানারকম ঠাণ্ডা পানীয় বা বোতলজাত জল (রেল নীর) ট্রেনের কামরায় সহজলভ্য ছিল না। লন্ডন ভিত্তিক 'পেরিয়ার' কোম্পানীই প্রথম জলকে ব্রান্ড-নাম দিয়ে বাজারে ছেড়েছিল। ব্যাপক প্রচার ও ব্যাপক মুনাফা। বিজ্ঞাপনে বাজার-মাত করার নিপুণ কারিগর ছিলেন লিও বার্নেট অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির প্রধান - রিচার্ড হোয়াটলে। তাঁর কথা ছিল, বিজ্ঞাপন পণ্যকে (বোতলবন্দী জল) গ্রহণযোগ্য, আরও গ্রহণযোগ্য এবং আকাঙ্ক্ষিত করে তুলবে (It made it acceptable, more than acceptable, it made it...desirable)। ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৪— মাত্র ১৫ বছরে তার বিজ্ঞাপন ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। প্যাকেজিং কর, আর বাজারে ছাড়-নীতি। বিজ্ঞাপনে বোতলজাত জলকে স্বাস্থ্যের প্রতীক বলেও প্রচার করা হয়। ফলে প্রচারে বিভ্রান্ত মানুষ বেশি করে কিনতে থাকে বোতলভরা জল। বিবিসি প্রকাশিত এক প্রবন্ধে জলকে সোনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে জলের বোতল বিক্রি একেবারে দ্বিগুণ হয়। বছরে ৫০ বিলিয়ন লিটার থেকে বেড়ে ১০০ বিলিয়ন লিটারে দাঁড়ায়। ১৯৮০-তে এক ফরাসী কোম্পানীর ব্রান্ড 'এভিয়ান' তার বিজ্ঞাপনে স্বাস্থ্যবর্ধক ও শারীরিক সক্ষমতার কথাটা জুড়ে দেয়— ''নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে 'এভিয়ান' পান করুন।'' বৃটিশ কোম্পানীর ব্রান্ড 'পেরিয়ার'-কে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাজারে ব্যাপক পরিচিতি করিয়েছিল ''বেভারেজ মার্কেটিং কর্পোরেশন''।

উত্তর আমেরিকার 'নেসলে ওয়াটার্স' (Nestle Waters)-এর প্রধান কার্যনির্বাহী কিম জেফ্রির মতে— ''আমি চাই আরও আরও বেশি টাকা। প্যাকেজিং করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার উপার্জন।'' জল এখন তরল সোনা।

পৃথিবীর তিনভাগই জল আর একভাগ মাত্র স্থল। তবুও স্বাধীনতার ৬৪ বছর পরেও ভারতের অনেক বড় বড় শহরেও বিশুদ্ধ পানীয় জলের যোগান দিতে সরকারি ব্যবস্থা

একপ্রকার ব্যর্থ বলা যায়। সকল অধিবাসীকে বিশুদ্ধ পানীয় জল যোগানে কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পুরোপুরি সফল নয়। হাওড়া, কলকাতা এবং রাজধানী দিল্লী— তিনটি শহরের অবস্থাই ধরা যাক।

হাওড়া :

বৃহত্তর হাওড়া শহরে সর্বত্র বিশুদ্ধ পানীয় জল যোগান দিতে পারছে না হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। পানীয় জলের অভাবে ভুগছে বেলিলিয়াস লেন, বেলিলিয়াস রোড, কদমতলা, পি এম বস্তি, চরার বস্তি, শালিমার, কয়লা ডিপো, বঙ্গবাসী এবং কোশল রোড। এই এলাকা হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯ নং ওয়ার্ড। শিবপুর, টিকিয়াপাড়া এবং ঘুসুড়িতেও পানীয় জলের জন্য হাহাকার। কিছুদিন আগে এক বালতি জলের জন্য মারামারি, হাতাহাতি থেকে একজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। কর্পোরেশন টিউবওয়েল বসানোর পরিকল্পনা করছে। এদিকে হাওড়া গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি এক সমীক্ষা করে জানিয়েছে ৬৭ শতাংশ জলই মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী। তারা রীতিমতো নমুনা পরীক্ষা করেই ওই মন্তব্য করেছে। এদিকে কর্পোরেশনের জল এবং স্যানিটেশন বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার অমল ব্যানার্জী বলেছেন, অব্যবস্থার জন্য কর্পোরেশনকে সম্পূর্ণ একতরফা দায়ী করাটা ঠিক নয়।

কলকাতা :

পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ২১০ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা নিচ্ছে বলে জানা গেছে। সম্প্রতি কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে মেয়র-ইন-কাউন্সিলদের সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, গার্ডেনরীচ পাম্পিং স্টেশন,টালা-পলতা পাম্পিং স্টেশন এবং ধাপা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে অর্থ ব্যয় করা হবে। এক বছরের মধ্যে গার্ডেনরীচ পাম্পিং স্টেশনের ক্ষমতা দ্বিগুণ করা হবে। মোদ্দাকথা হলো কলকাতাতেও সকল শহরবাসীর কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছায় না।

রাজধানী দিল্লী :

একদিকে দিল্লীতে জুন মাসেও প্রচণ্ড গরম, তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রী, অপরপক্ষে জলের জন্য হাহাকার। আম দিল্লীবাসী গলিতে গলিতে রাস্তায় রাস্তায় জলের বালতি এবং প্লাস্টিকের জেরিকেন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথায় সরকারি জলের গাড়ী (ওয়াটার ট্যাঙ্কার) ঢুকেছে। গৃহস্থরা ফোনে দুটো কথা বেশি করে আলোচনা করছে— আপনার ওখানে কলে (Tap Water) জল এসেছে? আর, এবার রাষ্ট্রপতি কে হচ্ছেন— প্রণববাবু না সাংমা! দিল্লীতে বেশ কিছু পরিমাণ জল হরিয়ানা থেকে আসে। দিল্লীতে জলের যোগান দেয় "দিল্লী জল বোর্ড।" বোর্ডের চেয়ারম্যান মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত নিজেই। বোর্ডের হিসাব অনুসারে দিল্লীতে প্রতিদিনকার জলের চাহিদা প্রায় ১১০০ মিলিয়ন গ্যালন (এম জি ডি)। অথচ সাধারণভাবে বিভিন্ন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট থেকে জলের যোগান আসে ৮৩৫ মিলিয়ন গ্যালন। দিল্লীতে তিনটি বড় জল পরিস্রুতকরণ ব্যবস্থা (ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) আছে— হায়দরপুর, ওয়াজিরাবাদ এবং চন্দ্রাবল। হায়দরপুর প্ল্যান্টের দৈনিক পরিস্রুত পানীয় জল যোগানের ক্ষমতা ২২৫ মিলিয়ন গ্যালন, বর্তমানে কমে ২০৭ মিলিয়ন গ্যালনে দাঁড়িয়েছে। ওয়াজিরাবাদ এর ক্ষমতা ১২৫ থেকে কমে ৮০ এবং চন্দ্রাবল প্ল্যান্ট ১০২ এর স্থলে মাত্র ৫৭ মিলিয়ন গ্যালন প্রতিদিন--- এসে ঠেকেছে। এর ফলে রাজধানীতে জলের হাহাকার দেখা দিয়েছে। কর্পোরেশনের জলের পাইপ লাইন দিয়ে জল আসছে সারাদিনে ঘণ্টা দেড়েক। মানুষ তাই পাত্রে ভরে খাওয়া-ধোওয়া- রান্নার কাজ চালাতে বাধ্য হচ্ছে। বালতিই ভরতি হচ্ছে না— ড্রাম তো দূরের কথা। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ— আধ বালতি জলে স্নান করুন। স্নান কি, পান করার মতো জলই নেই। সেখানে দিল্লীতে জলের এই হাহাকার যেখানে দক্ষিণ দিল্লীর প্যাটেল নগরে ১৮ ও ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপলাইন দীর্ঘদিন যাবৎ ফেটে গিয়ে জল বরবাদ হচ্ছে। রোজ কমকরেও ১ লক্ষ গ্যালন বহু মূল্য জল ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। গত ১৮ জুন বিজেপি নেতা বিজয় গোয়েল এবং দলের কেন্দ্রীয় সম্পাদক শ্যাম জাজু ওই ফাটা পাইপের বালতি-বালতি জলে জনসমক্ষে স্নান করে বিক্ষোভ দেখান। সরকার এতদিনেও কেন ব্যবস্থা নেয়নি সেটা এক রহস্য। হরিয়ানায় মুনক খাল তৈরিতে দিল্লী সরকার ৪০০ কোটি টাকা দিয়েছিল। কথা ছিল হরিয়ানা প্রতিদিন ৮০ মিলিয়ন গ্যালন জল যোগান দেবে দিল্লীকে। হরিয়ানা তা দিচ্ছে না। দুই কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীতে বাক্‌যুদ্ধ চলছে প্রতিদিন। আর এদিকে ভুগছে আম-জনতা।

জলের জন্য হাহাকার! দিল্লীর ওখলায় ট্যাঙ্কার থেকে জল সংগ্রহের আশায় মানুষের ভিড়।

জলের অপর নাম জীবন। সেই জল নিয়ে ছেলেখেলা চলছে বড় বড় রাজধানী শহরেও। তাহলে গ্রামগঞ্জের অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। দিন দিন বাড়ছে বোতলবন্দী জলের ব্যবসা। শখ করে এক-আধবার এক-আধ লিটার কেনা যেতে পারে। তার বেশি নয়। এরই মধ্যে বেঁচে থাকতে বাধ্য হচ্ছে ভারতবাসী। ▯

চিঠিপত্র

‘স্বস্তিকা’ দৈনিক হোক

আমি ‘স্বস্তিকা’র নিয়মিত পাঠক। ‘স্বস্তিকা’ কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা। পত্রিকাটি দীর্ঘ সাত দশক নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। স্বস্তিকার গুণী লেখক ও সাংবাদিকদের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও ক্ষুরধার লেখনী বাজার চলতি পত্র-পত্রিকার থেকে ভিন্ন। সাপ্তাহিক হওয়ার কারণেই প্রচার সংখ্যার সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়। তাছাড়া এমন এক গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা দৈনিক হলে পাঠক সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। স্বস্তিকা দেশের কথা ভাবে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতিবাদের হাতিয়ার।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থেকেও দেশটাকে গোল্লায় পাঠিয়েছে। ভুল নীতি আর নেতা-নেত্রীদের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি তাবৎ জনজীবনকে বিপন্ন করেছে। অথচ বাংলা সংবাদ মাধ্যম এককথায় নীরব কিংবা শাসক দলের প্রচারে ব্যস্ত। অর্থনীতিতে ভুল পদক্ষেপ আর বিদেশে গচ্ছিত হাজার হাজার কোটির কালো টাকা ও দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের দিকে কারোর নজর নেই। দীর্ঘ বামরাজত্বে বাংলা সংবাদপত্রগুলি সিপিএমের তাঁবেদারি করেছে, সত্যকে চেপে গিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ ছেপেছে। সাংবাদিকদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকী গত কয়েকবছর আগে যখন সিপিএম তথা বামেদের ভুল নীতির কারণে সিঙ্গুর- নন্দীগ্রামকাণ্ডে বাংলার মানুষের আজন্মলালিত অধিকার বিপন্ন তখনও একদল ‘ব্রান্ড বুদ্ধে’র জয়গান করতে ব্যস্ত। ৩৪ বছরের কালোদিন মুছে বাংলায় পরিবর্তন এল। এই পরিবর্তনে বুদ্ধিজীবী সমাজ ও মিডিয়ার ভূমিকার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর একটি গোষ্ঠী মমতার ঢাক বাজাতে ব্যস্ত। আবার তাঁবেদারির প্রসাদগুণে কেউ কেউ সাংসদ হয়ে গেলেন। মমতা যা করছেন তাই ‘ঐতিহাসিক’। পুলিশি তদন্ত চলতে চলতে নিজেকে হিরো ভাবা এক সাংবাদিক কাম সাংসদ আবার দলনেত্রীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলছেন— ‘সিপিএমের চক্রান্ত, সাজানো ঘটনা (পার্ক স্ট্রিট ও কাটোয়া ধর্ষণকাণ্ড)। ওই গোষ্ঠী চিটফান্ড কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত, সরকারও ঠুঁটো জগন্নাথ। অনেক ক্ষেত্রে রীতিমতো পেড নিউজ বের হচ্ছে। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ‘স্বস্তিকা’। শাসক দলের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সংবাদ পরিবেশন করেছে। ভুল কাজের নিন্দা করেছে, সঠিক কাজের উপযুক্ত প্রশংসা করেছে। স্বস্তিকা কোনও রাজনৈতিক দলের কাছে তার ‘সত্তা’ বিক্রি করেনি।

আমরা এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলছি। বাংলা তথা দেশের সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ঘটছে, চিরাচরিত ঐতিহ্য বিপন্ন, যুবসমাজ পথভ্রষ্ট। প্রতিটি সামাজিক ক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ আমাদের সংকটগ্রস্ত করেছে। স্বাভাবিক জীবন-জীবিকা আজ প্রশ্নের মুখে। মানুষের মনে উচিত- অনুচিত, ন্যায়-অন্যায়, বিবেক-বুদ্ধির বিলোপ ঘটছে।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি ঘৃণ্য খেলায় মেতেছে। মুসলিমরা হিন্দুদের আক্রমণ করছে। মঠ-মন্দির-সাধু-সন্তদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। হিন্দু যুবতী ধর্ষণের মতো জঘন্যতম অপরাধে অভিযুক্ত মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। মিডিয়া হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা নিয়ে বিচলিত নয়। বাংলার তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক দালাল হয়ে কাজ করছেন। ইমাম- মোয়াজ্জিনদের ভাতা প্রদান করে সরকার সংবিধানকে অমান্য করছে, ধর্মীয় ঐক্য বিনষ্ট হচ্ছে।

এবছর যেহেতু বীর সন্ন্যাসী যুবনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মবর্ষ তাই পথভ্রষ্ট যুবকদের সামনে স্বামীজীর আদর্শ তুলে ধরার দায়িত্ব ‘স্বস্তিকা’র। হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি ও বাংলার মানুষের চেতনার উন্মেষে ‘স্বস্তিকা’ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করুক। ‘স্বস্তিক’ প্রকাশন ট্রাস্টের কাছে একান্ত অনুরোধ, ‘স্বস্তিকা’ দৈনিক হোক। জাতীয়তাবাদী দৈনিক স্বস্তিকার অপেক্ষায় রইলাম।

—সমীর কুমার পড়্যা, চিরন্তনী পার্ক, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা-৭০।

রেলমন্ত্রীর কাছে আবেদন

১. পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা অথবা কোন প্রকারে বেঁচে থাকা শিল্পে যে, পরিকাঠামো আছে সেখানে একটু সহযোগিতা ও পরিবর্তনের মাধ্যমে রেলের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তু উৎপাদন হতে পারে খুব সহজেই যেমন, জেশপ বার্ন স্ট্যান্ডার্ড, ব্রেথওয়েট উল্লেখযোগ্য। বহুদিন ধরে শুনছি ওয়াগনের অভাবে রেল পণ্য পরিবহণ করতে না পারায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটছে এবং রেলের আয় বৃদ্ধি হচ্ছে না সুতরাং এই মুহূর্তে কর্মসংস্থানের একটা বড় উপায় ওই তিনটি কারখানার মাধ্যমে ওয়াগন উৎপাদনের ব্যবস্থা করা।

২. রেলের পড়ে থাকা জমি কাজে লাগানো— ভারতের সর্বত্র রেললাইনের ধারে পড়ে আছে অনেক ফাঁকা জমি, ওই জমিকে প্রয়োজনীয় সামান্য ১০/১৫ শতাংশ চরিত্র বদল করে, সুউ স্বল্প মেয়াদি ইজরার মাধ্যমে সৌন্দর্যায়ন (ফুল চাষ) শাক সব্জি চাষ, জলাজমিতে পদ্ম ফুলের চাষ পানিফলের চাষ সহ অল্প সময়ের মাছ চাষ সহজেই করা যেতে পারে। পাশের জমির কৃষকদের জমি ব্যবহারের সুযোগ দিলে রেল দপ্তরও গরীব কৃষকরা আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবে এবং জমি সুরক্ষিত থাকবে।

৩. কোয়ার্টার তৈরি— লাইনের ধারে ফাঁকা জমিতে রেল কর্মচারীদের জন্য বসবাসের ব্যবস্থা করলে কর্মীদের বাসস্থানের ও কর্মস্থলে আসার সুবিধা হবে সঙ্গে সঙ্গে বলা যায় যাত্রীবাহি ট্রেন অনেক সুরক্ষিত হবে এবং দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে চুরি, ডাকাতি এবং রেল লাইনে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের হাত থেকে রক্ষা করা সহজ হবে।

৪. বিগত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে রেলের ফাঁকা জমিতে ক্রমশ বসতি গড়ে উঠছে, বাজারে প্রচার হয়েছে রেল তার জমিতে বসবাসকারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে তাই নূতন নূতন স্থানে রেলের জমিতে বসতি স্থাপনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এই প্রবণতা যে কোনও মূল্যে বন্ধ করা উচিত। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে রেল লাইনের ধারে গড়ে ওঠা বসতির একটা বড় অংশ দুষ্কর্মের ঘাঁটি।

উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে রেল দপ্তর একটু পরিকল্পিত পরিকল্পনা করলে কেবলমাত্র রেলের আয়ই বৃদ্ধি হবে না, লক্ষ লক্ষ যাত্রীর কাছে রেলের মর্যাদা বৃদ্ধি সহ নিরাপত্তা বৃদ্ধি হবে এবং রেল দপ্তর অনেক বেশী সম্পদকে ক্ষতি বা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে।

—অমরকৃষ্ণ ভদ্র, বি ডি চ্যাটার্জী রোড, শিলিগুড়ি।

সমান্তরাল পৃথিবীর করিডরে

নীতিন রায়

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নগরী। স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মাদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছেন। সব ব্রহ্মা আসবে, দ্বারকা নগরী সেজেছে। দ্বাররক্ষীকে কিছু কথা বলে দিয়েছেন ব্রহ্মারা আসছেন। দ্বাররক্ষী তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করে শ্রীকৃষ্ণ সকাশে পাঠাচ্ছেন। আমাদের ব্রহ্মা এলেন, দ্বাররক্ষী কিছু জিজ্ঞসা করতেই চটে গেলেন। তিনি বললেন আমি ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা আমি তো একা। আমার আবার পরিচয় কি? নারায়ণকে গিয়ে বলো ব্রহ্মা এসেছেন। দ্বাররক্ষী বললো নারায়ণের নির্দেশ, আপনাকে বলতে হবে আপনি কোন্ ব্রহ্মা? অগত্যা ব্রহ্মা পরিচয় দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। গিয়ে দেখলেন অসংখ্য ব্রহ্মা বসে আছেন, তিনি একা নন। তাঁর ভুল ভাঙলো। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় কল্পকথা, কিন্তু সমান্তরাল ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বই ওই কল্পকথাকে সত্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের চারিদিকে সমান্তরাল পৃথিবী রয়েছে। সেখানে আমি থাকতে পারি আবার আমার কিছুটা ভিন্ন আদলও থাকতে পারে। সেখানে পৃথিবীর নিয়মগুলো কাজ করছে। হয়তো বা আরও ভয়ঙ্কর ভাবে কাজ করছে। এটি একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। পদার্থ বিজ্ঞানের জনপ্রিয় বিষয়।

পদার্থ বিজ্ঞানের তত্ত্বে চমক এনেছে কোয়ান্টাম তত্ত্ব। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী Sub Atomic Particle গুলো বিচিত্রভাবে কাজ করে অনেক সময় ব্যাখ্যাকারীকে চমকে দেয়। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী এই ব্রহ্মাণ্ডে তরঙ্গ ও কণিকার সমাহার কণিকা ও তরঙ্গ স্ব স্ব ভূমিকায় থাকবে। এই সাধারণ নিয়মকে ভেঙে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী কণিকা অনেক ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটাতে পারে। এ অদৃশ্য হতে পারে আবার দৃশ্যও হতে পরে। একজন বিজ্ঞানী বলেছেন ধরুন ১৩টি নিউট্রন কণা ব্রহ্মাণ্ড থেকে হারিয়ে গিয়ে ঘুরে ফিরে আবার যথাস্থানে ফিরে এলো। এমনও হতে পারে ১৩টি নিউট্রন কণা একসঙ্গে কলকাতায় আবার নিউইয়র্কে দেখা গেল।

এল্যান গুথ নামে এক বিজ্ঞানী সামন্তরাল পৃথিবীর কথা প্রথম বলেন। তাঁর তত্ত্বে রেফারেন্সগুলোকে Inflationary Universe or theory of Cosmology বলা হয়। প্রফেসর গুথ বলেন, পৃথিবী সৃষ্টির সময় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান ছিল বস্তুকে একত্রিত রাখবার জন্য। তিনি বলেছেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবার বিপরীত দিকেও ছিল। যার ফলে 'ফলস ভ্যাকুয়াম' সৃষ্টি হয়েছিল। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের অনেক Dimension তৈরী হয়েছে। কেউ বলেন ১১টি আবার কেউ বলেন বুদবুদের মতো অসংখ্য। দুটো বুদবুদ সংঘর্ষে যেমন ফেটে যায়, তেমনি দুটো পৃথিবীর সংঘর্ষে নূতন Big Bang। আবার নূতন সৃষ্টি। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা আমরা অন্য সামন্তরাল ব্রহ্মাণ্ডকে যেমন দেখতে পাচ্ছি না তেমনি তার দূরত্ব আমার থেকে মাত্র ১ মিলি মিটার।

এসব কথা তত্ত্বে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলেও। আমার উপস্থিতি ২০১২ সালে সমস্ত Dimension-এ থাকতে পারে। কোথাও হয়তো আমি সাধু অন্য কোথাও হয়তো টেরিস্ট। কোথাও হয়তো বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটছে, কোথাও হয়তো বৃটিশ সাম্রাজ্য অস্ত গেছে।

"The Universe Multiple Reality" বই এর লেখক Mr. Franks। তিনি কানাডার একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী। তার বইতে তিনি বলেছেন পৃথিবীর বাস্তব একটা মাত্র নয়। আমরা অন্য পৃথিবীতেও বেঁচে আছি। কোয়ান্টাম পদার্থ বিজ্ঞানের মাধ্যমে জানা যায় পৃথিবী পরিবর্তনশীল। বাস্তব কোনও বিষয় নয়। কন্সাস্নেস কেবল মাত্র রিয়েলিটি। তাই তিনি খুঁজেন সামন্তরাল পৃথিবীর করিডর। এক সমান্তরাল পৃথিবী থেকে অন্য সমান্তরাল পৃথিবীতে যাওয়ার পথ। খুঁজে পাওয়া সম্ভব কারণ কনসাসনেস একমাত্র রিয়েলিটি। কনসাসনেস-ই একমাত্র করিডোর।

কনসাসনেস কী প্রথমে দেখি স্বামী বিবেকানন্দের চোখে। কনসাসনেস একশক্তি যা বদ্ধজীবে রয়েছে অপূর্ণ ভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলেই তা বদ্ধজীবের মুক্তি ঘটে। বদ্ধ আত্মায় চেতনশক্তি সূক্ষ্ম, ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে বিরাজমান। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "উদ্ভিদ শক্তি চৈতন্য বিবর্জিত ক্রিয়াশক্তি বলিয়া আপত্তি তোলা যাইতে পারে। এই সচেতন উদ্ভিদশক্তি সেই বিরাট বিশ্বব্যাপী বুদ্ধিশক্তি, যাহাকে সাংখ্যকাররা মহৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন সেই এক চেতন ইচ্ছারই অভিব্যক্তি"।

তিনি আরও বলেছেন, প্রাণের ক্রমবিকাশকে পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে। ব্যক্ত ও অব্যক্ত নিত্য অনুবর্তন করে পদার্থ বিজ্ঞানই তা প্রমাণ করতে পারে। কাজেই বাসনা ও সংকল্পের যে অভিব্যক্তি তাহার পূর্বাবস্থান মহৎ বা বিশ্বচেতনায় গুপ্ত অথবা সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করে।

সমস্ত জীবজগতের চেতনাকে অবস্থা অনুসারে তাদেরকে বৈদিক শাস্ত্রে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(১) আচ্ছাদিত চেতন— জীবাণু উদ্ভিদ। (২) সংকুচিত চেতন— কীটপতঙ্গ জলজ। (৩) মুকুলিত চেতন— পশুপাখী। (৪) বিকশিত চেতন— মানুষ। (৫) পূর্ণবিকশিত চেতন— ভগবান ভক্ত।

বিজ্ঞানের চোখে কনসাসনেস হচ্ছে চেতনশক্তি বা আদি সত্তা। এই আদি সত্তা সৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। Big bang হলো। টাইম ও স্পেস-এর কাজ শুরু হলো। Big bang -এর পূর্বে সব সুষুপ্তিতে ছিল। যেহেতু সব শূন্য ছিল সেহেতু আজকের কোনও সূত্রই কাজ করেনি তখন। সেই আশ্চর্য সময়ে (যখন সময় ছিল না) সময় ও স্পেস-এর সঠিক টিউনিং করলো কে? এই কনসাসনেস সেখানে সূক্ষ্মরূপে ছিল। ডঃ মণি ভৌমিক একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন, মা সন্তানের জন্ম দেয়— সেই কারণে তার শরীরে দাগ হয়। ধীরে ধীরে দাগগুলো চোখের আড়ালে চলে যায় কিন্তু শরীরে তা থাকে। সৃষ্টির সময় আদি সত্তা ভুবনে ছিল। আজও আছে। আমরাও তার উপলব্ধি করতে পারি মহতের ধ্যানে। ক্লোনিং পদ্ধতিতে আইনস্টাইনের কপি করা সম্ভব। কিন্তু তা আইনস্টাইনের মতো মেধাবী হবে এমন কথা নেই। কারণ কনসাসনেস ক্লোন করা যায় না। জিন বা ডি এন এ কনসাসনেস নয়। কনসাসনেস তার মাধ্যমে অভিব্যক্তি রূপে প্রকাশ ঘটায়।

কনসাসনেস-কে দেখা যায় না। ইলেকট্রনকে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু ফিলামেন্ট দিয়ে যখন ইলেকট্রন চলাফেরা করে তখন আলো জ্বলে। তখন আমরা বুঝতে পারি সেখানে ইলেকট্রন রয়েছে। তেমনি কনসাসনেসকে দেখা যায় না কিন্তু তার অভিব্যক্তি বা প্রকাশকে উপলব্ধি করা যায়।

এক সমান্তরাল পৃথিবী থেকে অন্য সমান্তরাল পৃথিবীতে যাওয়ার একমাত্র পথ কনসাসনেস। আমার যে প্রতিরূপ বিভিন্ন সমান্তরাল পৃথিবীতে আছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে আমার ভিতর সূক্ষ্মভাবে বিরাজিত আদিসত্ত্বা। তাই ধ্যানের মাধ্যমে মনকে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা অন্য সমান্তরাল পৃথিবীর খোঁজ করতে পারি। □

পরম্পরা

তীর্থকথা

অমরনাথ

নবকুমার ভট্টাচার্য

মা পার্বতী ভগবান শিবের কাছে জগৎসংসার সৃষ্টি এবং ভগবান শিবের অমরত্ব লাভের কথা শুনতে চাইলে, ভগবান শিব এই গোপনীয় কথা শোনাবার জন্য সম্পূর্ণ জনমানবহীন অমরনাথ গুহা নির্বাচন করেন। কারণ তিনি চাননি আর অন্য কেউ এই অমরকথা শুনুক। এই গুহার পথে যাওয়ার সময় শিব নন্দীকেশরকে পহেলগাঁওতে রেখে যান, চন্দনবাড়িতে শিব তাঁর জটা থেকে চাঁদকে ছেড়ে যান, শেষনাগে শিব তাঁর গলার সাপকে ছেড়ে দেন। মহাগুনাস পর্বতে পুত্র গণেশকে শিব বসিয়ে রেখে যান, পঞ্চতরণীতে শিব ছেড়ে যান— ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম। গুহার ভিতর ধ্যানে বসে শিব তাঁর কালাগ্নি প্রজ্বলিত করেন যাতে ওইখানে কোন প্রাণ না থাকে। কোনও প্রাণ নেই নিশ্চিত হয়েই শিব তাঁর অমরত্বের কথা মা পার্বতীকে বললেন, কিন্তু বিধির বিধানে একটি অর্ধস্ফুট ডিম মা পার্বতী ও ভগবান শিবের আসনের নিচে সুরক্ষিত থেকে যায়। পার্বতী ও শিবের আসনের নিচে থাকার জন্য ওই ডিমটিকে কালাগ্নি স্পর্শ করতে পারেনি। পরবর্তীকালে ওই ডিম ফুটে দুটি পায়রা জন্ম নেয়। শিবের অমরকথা শুনে তারা আজও অমর হয়ে আছে। অমরনাথ যাত্রীরা ওই গুহার আশেপাশে আর কোনও প্রাণের দেখা না পেলেও ওই দুটি পায়রার দর্শন অবশ্যই পাবেন। আর শিব যে স্থানে বসে তাঁর অমরত্বের কথা শুনিয়েছিলেন পরবর্তীকালে ঠিক সেখানেই তাঁর তুষারলিঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। এই তুষার লিঙ্গ দর্শনের জন্যই সারাবছর প্রতীক্ষা করে ভক্তেরা। যাত্রাপথ দুর্গম এবং বিপদসঙ্কুল বলেই রয়েছে নানা নিয়ম কানুন এবং বিধিনিষেধ। এবছর যাত্রা শুরু হয়েছে ২৫ জুন এবং যাত্রার পরিসমাপ্তি ৪ আগস্ট।

কিভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে প্রতি মঙ্গল, শুক্র, শনিবার ২৩টা ৫৫ মিনিটে ছাড়ছে ১২৩৩১ হিমগিরি এক্সপ্রেস এবং চিৎপুর কলকাতা স্টেশন থেকে প্রত্যহ ছাড়ছে সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে ১৩১৫১ জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস। জম্মু স্টেশন থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার শহরের ভেতরে বাস ও গাড়ির স্ট্যান্ড। অমরনাথ যাত্রার দুটি রুট রয়েছে। একটি পহেলগাঁও দিয়ে এবং অন্যটি বালতাল হয়ে। বালতালের রাস্তা অনেক খাড়াই এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অভাবে পহেলগাঁও দিয়ে অমরনাথ যাত্রা করেন প্রায় সবাই। জম্মু থেকে পহেলগাঁও দূরত্ব ৩০০ কিমি অর্থাৎ গাড়িতে প্রায় ১১ ঘণ্টা লেগে যায়। ভাড়া টাটা সুমোতে গাড়ি পিছু পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা। এই ভাড়া বাড়তে কমতে পারে। তবে পহেলগাঁও থেকে গাড়িতে করে আরেকটু এগিয়ে অমরনাথ যাত্রার বেসক্যাম্প চন্দনবাড়িতে নামাই যুক্তিযুক্ত। এখান থেকে হাঁটা পথের শুরু। যাঁরা হেঁটে যেতে পারেন না তাঁদের এখান থেকেই ঘোড়া বা ডান্ডি ভাড়া করে নিতে হয়। কলকাতা থেকে পরচি বা রেজিস্ট্রেশন কাগজ এখানেই পরীক্ষা করা হয়। সচিত্র পরিচয়পত্রের মাধ্যমে পরচি পরীক্ষা করিয়ে তবেই হাঁটাপথের অনুমতি মেলে।

বুকিং

অমরনাথ যাত্রার বুকিং অনলাইন বা সরাসরি জম্মু কাশ্মীর ব্যাঙ্ক থেকে করতে হয়। অনলাইন বুকিং করতে হলে www.amarnathyatra.org ওয়েবসাইটে গিয়ে বুকিং করতে হয়। কলকাতার R.N. Mukherjee Road-এর J & K Bank Ltd.-তে সরাসরি রেজিস্ট্রেশন বা পরচি করা যায়। বালতাল ও পহেলগাঁও দুটি রুটের জন্য আলাদা ফর্ম রয়েছে। দু কপি ফোটো এবং ভোটার কার্ড-এর জেরক্স ও আসল সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ্কে যেতে হবে। এই একই ওয়েবসাইট থেকে অমরনাথ যাত্রার জন্য হেলিকপ্টারও বুক করা যায়। এজন্য ভাড়া বালতাল থেকে পঞ্চতরণী ১৪৪৫ টাকা, বালতাল-পঞ্চতরণী-বালতাল-২৮৯০ টাকা। পহেলগাঁও- পঞ্চতরণী ২৩৫৫ টাকা, পহেলগাঁও-পঞ্চতরণী-পহেলগাঁও-৪৭১০ টাকা।

কোথায় থাকবেন

প্রথমে পহেলগাঁওতে প্রচুর থাকার হোটেল, আবাস রয়েছে। ভাড়া ৪০০ থেকে ১০০০ এর মধ্যে। অমরনাথ পহেলগাঁও দিয়ে যাত্রাপথে বা অমরনাথে থাকার জন্য তাঁবুর ভাড়া জনপ্রতি ৮০ থেকে ১০০ টাকা। একটি বড় টেন্টে ১০ থেকে ১২ জন থাকতে পারে। পহেলগাঁও দিয়ে যাত্রা হলে প্রথমরাত ১২ কিমি দূরে শেষনাগে। তারপর দিন ১১ কিমি দূরে দ্বিতীয় রাত পঞ্চতরণী। আরও ৬ কিমি এগিয়ে অমরনাথেও রাত্রিবাস করা যায়। বালতাল দিয়ে অমরনাথের দূরত্ব ১০ কিমি। শ্রীনগর থেকে বালতাল ৩০ কিমি।

কি খাবেন

রাস্তায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রচুর ভাণ্ডারা পাবেন। সুস্বাদু এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ এই খাবার।

কী কী জিনিস অবশ্যই সঙ্গে নেবেন

সঙ্গে অবশ্যই ভোটার আই কার্ড এবং ২ কপি ফোটো। পর্যাপ্ত শীতের পোষাক। টর্চ, বমি, পেট খারাপ, জ্বর এবং মাথাঘোরার ওষুধ। শুকনো কিসমিস, জিওলিন এবং কর্পূর। ■

বামাক্ষ্যাপার জীবন বৃত্তান্ত

রবীন সেনগুপ্ত

বাংলার বিখ্যাত তন্ত্রসাধক বামাক্ষ্যাপা, বীরভূম জেলার আটলা গ্রামে ১২৪৪ বঙ্গাব্দের ১২ ফাল্গুন এক শাক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীবামার জন্ম সাল নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ ১২৪১ বঙ্গাব্দকেও বাবার জন্ম সাল হিসাবে গণ্য করেন।

বামাক্ষ্যাপার পিতার নাম ছিল সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মাতা রাজকুমারী দেবী। সর্বানন্দ অল্প বয়সেই মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি তারামায়ের গান রচনা করে গাইতে পারতেন। মাতা রাজকুমারীও ধর্মশীলা ছিলেন।

জন্মের পর প্রায় আড়াই বছর বামা কোন শব্দ করেননি। তাঁর প্রথম উচ্চারিত শব্দ হলো বাম। সেই অনুযায়ী তাঁর নামকরণ হয় বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, যা লোকমুখে বামাক্ষ্যাপা নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। ছেলেবেলা থেকেই বামার পড়াশুনায় চাইতে পূজা অর্চনায় মন ছিল বেশি। প্রথাগত পড়াশুনা প্রাথমিক স্তরেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অধ্যাত্ম বিষয়ক গ্রন্থ শ্রবণের মাধ্যমে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন বালক বামাচরণ। সঙ্গীতে দক্ষ হওয়ায় পিতা-পুত্র নানা অনুষ্ঠান করার জন্য আটলা, দিপাড়া, চাকপাড়া, উদয়পুর, বামদেবপুর, কড়কড়িয়া এইসব এলাকায় ডাক পেতেন প্রায়ই। করতেন কৃষ্ণ বিষয়ক যাত্রাপালা। বামা কৃষ্ণ সাজতেন। অভিনয় করার সময় আধ্যাত্মিক ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে যেতেন বামাচরণ।

বামার উপনয়ন হয় ১২৬১ বঙ্গাব্দে। পরের বৎসরই পিতা সর্বানন্দ কালী মায়ের নাম করতে করতে দেহত্যাগ করলেন। বামার কর্মজীবন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু অধ্যাত্ম ভাবাবেশ অত্যধিক মাত্রায় বিদ্যমান থাকার দরুন বামা পেশাদার কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করতে পারেননি। ভোগ রাঁধুনি হিসাবে নিযুক্ত বামা অন্যমনস্কতার জন্য রান্না পুড়িয়ে ফেলতেন। রাখাল হিসাবে নিযুক্ত বামা কর্মে ভ্রান্তির জন্য তিরস্কৃত হতেন। কিন্তু মৌলীক্ষা পীঠে যখন সাধক জীবন শুরু হয় তখন বামার মনোযোগ গুরুদের মুগ্ধ করে তুলেছিল। প্রথাগত মন্ত্র পড়ে পূজা করতেন না বলে নালুটীর নানকার জমিদারদের পূজারীর মাসিক ২ টাকা বেতনের চাকুরীও বামাকে খেয়োতে হলো। মামারবাড়ির কাজেও তিনি ব্যর্থ হলেন। কিন্তু তারাপীঠে ব্রজবাসী কৈলাসপতি ও বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দের সান্নিধ্য বামাকে সাধক হিসাবে পরিণত করে তুলল দ্রুতগতিতে। গ্রামে আগুন লাগানোর অভিযোগে অভিযুক্ত বামাকে তারা মা রক্ষা করলেন একবার অলৌকিক ভাবে। ১২৬৪ বঙ্গাব্দে বামা কুলগুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন, গেরুয়া বসনও ব্যবহার করতে লাগলেন দুর্গাদাস সরকারের সৌজন্যে। বামার সন্ন্যাস গুরু হিসাবে ব্রজবাসী কৈলাসপতি ও মোক্ষদানন্দের নাম দুটি পাওয়া যায়। ১২৭১ বঙ্গাব্দে মোক্ষদানন্দ বামাকে নিয়ে কাশী যান ও ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। কাশী থেকে ফিরে বৈদ্যনাথধাম দর্শন করেন বামাচরণ।

ক্ষেপি ভৈরবী নামে এক সুন্দরী সাধিকা বামাকে কামমোহে ফেলার প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বামার সন্ন্যাসিনী দিদি যোগে দেহত্যাগ করেন। ১২৭৩ বঙ্গাব্দে নাটোরের তহশীলদার নীলমাধব বামাকে এক সুন্দরী মহিলা দিয়ে ফাঁদে ফেলার প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১২৭৪ বঙ্গাব্দে তারাপীঠের বিখ্যাত সিদ্ধস্থান শ্বেত শিমুল গাছটিতে অগ্নি সংযোগ করেন বামা। তিনদিন ধরে সেই আগুন জ্বলেছিল। ওই বছরই বামা ব্রহ্মবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। তারপর বিখ্যাত কপিলেশ্বর শিব মন্দির দর্শনে যান।

১২৭৯ খৃস্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে দর্শনের জন্য আসেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথকে জানান যে, পথে আপনি একটা বিশাল ক্ষেত্রের মাঝে ছাতিম গাছ পাবেন। ওই ছাতিমতলায় বসে ধ্যান করবেন। পরে সেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করবেন।

সত্যসত্যই পরে ওই স্থানেই শান্তিনিকেতন গড়ে ওঠে।

১২৮২-তে পাহাড়িবাবা বামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাছাড়াও লালক্ষ্যাপা, বিশেক্ষ্যাপা, ভগবান ব্রহ্মচারী, তারাক্ষ্যাপা প্রমুখ ৯ জন বিখ্যাত সন্ত বামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বামাক্ষ্যাপার সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল।

১২৮৯ বঙ্গাব্দে বছর বিশেকের যুবক নরেন্দ্রনাথ দত্ত বামা দর্শনে আসেন। বামা ভবিষ্যৎ-বাণী করেন যে এই যুবক সনাতন ধর্মের মুখোজ্জ্বল করবে। পরে নরেন্দ্রনাথের স্বামী বিবেকানন্দ রূপে আত্মপ্রকাশের কাহিনী সবারই জানা।

১২৯০ বঙ্গাব্দে বামার মা গত হন। ১২৯৮-এ কাশীর তৎকালীন বেদ বেদান্তবিদ ভারত ও তিব্বত পর্যটনকারী পণ্ডিত তারাপীঠে এসে বামাক্ষ্যাপার অধীনস্থ হয়ে তন্ত্র সিদ্ধি করে যান। কাশ্মীরের মহারাজাও বামাকে এসে দর্শন করে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে যান। রাজশাহীর মাদানপুর থেকে এক ভক্তের বাল বিধবা মেয়েকে বামা দায়িত্ব নিয়ে বুড়িমা নামে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্না সাধিকায় রূপান্তরিত করেন। বামা একবার ভাগলপুরে গিয়ে টানা দশ-বারো দিন অবস্থান করে যোগসাধনা বিষয়ক বক্তৃতা করে সকলকে মুগ্ধ করে দেন।

বামার সারমেয় প্রেম ছিল বিখ্যাত। বহু কুকুরকে তিনি নিজের আশ্রয়ে রেখে দিতেন। বামা সারাজীবনে বহু আশ্চর্য ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। যা নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। হয়েছে বামাকে নিয়ে চলচ্চিত্র ও সিরিয়াল। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে এই ভারতবিখ্যাত বাঙালি তন্ত্রসাধকের দেহাবসান হয়। ▯

(বামাক্ষ্যাপার তিরোভাব তিথি উপলক্ষে প্রকাশিত)

ছোটোদের মজার ক্লাস

নবাঙ্কুর

‘আমি যদি প্রধানশিক্ষিকা হতাম’

স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি নানাধরনের ক্লাস হয়। তার মধ্যে থাকে অন্যরকম মজা আর আকর্ষণ। একইরকমভাবে ক্লাস করতে করতে ছোটোরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে— এটা ভালো বোঝেন সাগরিকাদি। সাগরিকা রায়। ছোটোদের কথা সবসময় মন দিয়ে শোনেন। কারও কোনও সমস্যা থাকলে জানতে চান। কখনও রাগেন না, বকেন না। তিনি সেদিন ক্লাসে ঢুকে বললেন, ‘আজকে একটু অন্যরকম কাজ হবে। আমি একটা বিষয় বলে দিচ্ছি। যার নাম ডাকবো সে সামনে এসে কয়েকটা কথা বলবে। অবশ্য বেশিক্ষণ নয়, চারপাঁচটা বাক্য। তারপর থামার ঘণ্টা বাজবে। পরে যার নাম ডাকা হবে সে বলবে।’ সাগরিকাদি বোর্ডে লিখে দিলেন : ‘আমি যদি প্রধানশিক্ষিকা হতাম।’

প্রথম নাম সংহিতা। সে দাঁড়িয়ে বলা শুরু করল। ‘প্রধানশিক্ষিকা হলে আমি পড়ার বোঝা কমিয়ে দিতাম। পড়া পড়া নিয়ে বেশি মাতামাতির বদলে ‘পড়া পড়া খেলা’ চালু করে দিতাম। শুধু মজায় ভরা থাকবে স্কুলের দিনগুলো।’

এরপর বলা শুরু করল সুচেতনা, ‘আমি সব ক্লাস যাতে খোলা মাঠে হয় তার ব্যবস্থা করতাম। মাঠে গাছ আর শেড থাকত। আলো ছায়ার মধ্যে থাকলে সূর্যের তাপে কষ্ট হোত না। বইপত্র খুব কম আনতে বলতাম।’

পরের নাম চয়নিকা। বলল, ‘স্কুল থেকে রোজ ভালো টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা করতাম। বাড়ি থেকে টিফিন আনতে হোত না কাউকে। যেসব মেয়ের বাড়ির অবস্থা ভালো নয় তারা খুশি মনে একসঙ্গে খাবে অন্যদের পাশে বসে।’

এবার বলার পালা এলো বিশাখার। সে বলল, ‘স্কুলে বকাবকির ব্যাপার থাকত না। কেউ একটু বেশি দুষ্টুমি করলে কোনও শাস্তি দেওয়ার বদলে আমার ঘরে তার মানে বড়দির ঘরে ডেকে বলতাম, আমার পাশের চেয়ারে বসে গান শোন রবীন্দ্রনাথের। বই পড়ো ছোটোদের।’

অনিন্দিতা এবার বলল, ‘কোন কোন মেয়ের বাড়ির অবস্থা কেমন খোঁজ নিতাম ঠিকভাবে। কার কোথায় অসুবিধে হচ্ছে জেনে নিতাম সবসময়ে। আমার ঘরে সবসময় ছাত্রীদের ঢোকার অনুমতি থাকত।’

এবার বলতে উঠল মঞ্জুশ্রী, ‘হোমটাস্ক জিনিসটা উঠিয়ে দিতাম। পড়াশোনা যেটুকু হবে তা স্কুলেই। বাড়িতে কোনও পড়ার চাপ থাকবে না। সেখানে একটু আধটু পড়বে। খাবে, খেলবে, ঘুমোবে। শরীর মন তাজা রেখে স্কুলে আসবে।

এবার বলার পালা শিখার। সে বলল, ‘পরীক্ষা বলে কোন জিনিস থাকবে না। সারাবছর আনন্দে পড়াশোনা চলবে। কোনও পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপার না থাকলে শেখার মজা বাড়বে।’

এবার বলতে শুরু করল তৃণা। ‘আমি প্রধানশিক্ষিকা হতে চাইনা। কারণ বড়দিকে অনেক কষ্ট পেতে হয় প্রতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে মেয়েরা চলে গেলে। আমি অত কষ্ট সহ্য করতে পারব না।’

সাগরিকাদি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কেমন লাগল তোমাদের?’

মেয়েরা বলল একসঙ্গে, ‘খুব মজা পেয়েছি আমরা।’

‘মজা পেয়েছি আমিও।’ বললেন বড়দি মঞ্জুলিকাদি। মেয়েরা বুঝতে পারেনি কখন বড়দি এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

কৌশিক গুহ

বইপড়ার কথা

নিয়মিত বই পড়া দরকার

‘বইপড়া চাই নিয়মিত’ একথা মন্টুস্যার সবাইকে বলেন। সেজন্যে অনেক বইয়ের খবর তাঁর ঝুলিতে থাকে। ছোটোদের নানারকম বই পড়তে উৎসাহ দেন। বই উপহার দেওয়াও তাঁর একটা কাজ। বই সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতে চাইলে হুটহাট কথা বলেন না। ভেবেচিন্তে জেনেশুনে বলেন। ফলে তাঁর দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করা যায়। সকলকে বলেন, ‘বই পড়তে হবে মন দিয়ে। একটা খাতায় বইয়ের নাম লেখকের নাম প্রকাশকের নাম দাম লিখে রাখা দরকার। বছর শেষে যদি পড়ার হিসেব নেওয়া যায় তাহলে জানা যাবে কোন কোন বই পড়ার তালিকায় ছিল। কোন কোন বই শুধু একবার পড়ার জন্যে। কোন বই দুবার পড়া যায়। খুব অল্প বই-ই বারবার পড়া যায়।’ ‘পড়াশোনার মতো জিনিস নেই’— এই কথাটা বলেন বারবার সব ক্লাসের ছেলেকে। মন্টুস্যারের বাড়িতে প্রচুর বই। প্রত্যেকটা বই নিয়মিত তাঁর যত্ন পায়। তিনি বইয়ের যত্ন নিতে বলেন সবসময়।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখেছেন দুজন বিখ্যাত মানুষ। তাঁদের নাম ও পেশা কি ছিল?

২. প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট কাদম্বিনী বসু কার স্ত্রী ছিলেন? তাঁর এক দৌহিত্র বিখ্যাত লেখক। নাম?

৩. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম এবং মৃত্যু কবে? তাঁর জন্মস্থান কোথায়?

৪. ‘এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ/মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান’। একথা কে লিখেছিলেন? কার সম্বন্ধে? কোন উপলক্ষে? অনুরোধ ছিল কার?

৫. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলেমেয়ের নাম কি? তাঁদের জন্ম মৃত্যু?

উত্তর ১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারিক। প্রশান্ত পাল। অধ্যাপক। ২. দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সুকুমার রায়। ৩. ১৯ জুলাই ১৮৬৩। ১৭ মে ১৯১৩। কৃষ্ণনগর। ৪. রবীন্দ্রনাথ। চিত্তরঞ্জন দাশ। চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিস্তম্ভে লেখার জন্যে। বিধানচন্দ্র রায়ের। ৫. সুরেন্দ্রনাথ (২৬.৭.১৮৭২-৩.৫.১৯৪০)। ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী (২৯.১২.১৮৭৩-১২.৮.১৯৬০)।

ছোটোদের বলছি

উলটো পালটা

সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সবজান্তা মানুষ। তাঁর ছেলে শ্রবণ একইরকম ভাবে তৈরি। তবে মাঝে মধ্যে বাবা ছেলের কথা হয়। গুরুগম্ভীর আলোচনা।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করলেন ছেলেকে, ‘তোমার পড়া আর খেলা ঠিকমতো চলছে তো?’

শ্রবণ বলল, ‘হ্যাঁ দুটোই চলছে। তবে রক্ষণাত্মক।’

সুশান্তের প্রশ্ন, ‘সেটা কেমন?’

শ্রবণের উত্তর, ‘ব্যাপারটা হলো স্কুলে লাস্ট বেঞ্চে বসি। ক্রিকেট খেলার সময় ব্যাট করতে নামি এগারো নম্বরে।’

।। ২।।

তপোব্রত স্কুলে হাজির হলো নেড়া মাথায়। অনেকেরই প্রশ্ন। অঙ্কের শিক্ষক বিকাশ রায় জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি ব্যাপার, হঠাৎ এরকম মুণ্ডিত মস্তক কেন?’

তপোব্রত বলল, ‘আমাদের বাড়ির কেউ গত হননি। তবে বাবা-মায়ের অত্যাচার ইদানিং বেড়ে গেছে। কথায় কথায় চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাচ্ছিলেন। একবার মা। একবার বাবা। কি আর করি। পাড়ার ইটালিয়ান সেলুনে গিয়ে বসলাম। বললাম, ন্যাড়া করো।’

।।৩।।

বাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। লোকে হিমসিম খায়। আবার বাজার না করলেও চলে না। ‘আর পারা যাচ্ছে না’— এমন কথা সকলের মুখে শোনা যায়।

নবারুণবাবু কাগজ পড়ছিলেন। তাঁর গিন্নি বললেন, ‘জিনিসপত্রের দাম এত বাড়লে আমরা কি করবো?’

নবারুণ কাগজ থেকে মুখ না সরিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, ‘সকলে বাজার করতে যাবে কষ্ট করে। আমরা তাদের দেখবো আরাম করে বসে।’

রামগরুড় সংকলিত

অঙ্গনা

আইনী সচেতনতা

নারীর অধিকার প্রাপ্তি ও কর্তব্যবোধ

অরুণা মুখোপাধ্যায়

একটা কথা আছে "Rights and duties are corelative terms" অর্থাৎ অধিকার ও কর্তব্যবোধসমূহ শব্দটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই প্রসঙ্গে নারীর অধিকার বিষয়ক আলোচনা করলে দেখা যাবে বহু নারীই, সে বিবাহিতাই হোন বা অবিবাহিতাই হোন প্রায়ই নারীপ্রগতির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তাঁদের 'অধিকার' শব্দটিই বিশেষভাবে প্রতিফলিত করেন। কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে তাঁরা থাকেন নিরুত্তর। দীর্ঘ আইনজীবনের অভিজ্ঞতায় চেম্বারে বহু মক্কেলদের মধ্যে অনেক মহিলাকেই বলতে শুনি— 'বিয়ে যখন করেছি তখন আমার শ্বশুরবাড়ি ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, আমার ইচ্ছায় যে কোনও সময়ে আমি আমার নিজস্ব স্বাধীনতায় শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আসতেই পারি আমার অধিকারবোধে, শ্বশুরবাড়ির আদর যত্নকে উপেক্ষা করে তাদের মতকে মূল্য না দিয়ে; প্রাক্‌বিবাহিত জীবনের প্রেমিকের সঙ্গে বাকি জীবন কাটানোর অধিকারও আমার কেউ কেড়ে নিতে পারে না।' অনেক মেয়েকে চতুর দৃষ্টিতে হাসিমুখে বলতে শুনেছি 'ভালমানুষ স্বামীকে তার মা-বাবার কাছ থেকে আলাদা করতে পারলে তবে তো আমার অধিকার আরও দ্বিগুণ বাড়বে' অর্থাৎ আইনসিদ্ধ বিবাহের দ্বারা স্বামীর কাছ থেকেও খোরপোষের অধিকার আমার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। স্বামীর মা-বাবাকেও পয়সা দেওয়া বন্ধ হবে। আর সন্তানের মা হতে পারলে তো আমার পোয়া বারো। আরও বহু বহু টাকা সন্তান ও আমার জন্য স্বামীর কাছ থেকে টেনে টেনে বার করার জন্য তাকে শয্যাশায়ী পর্যন্ত করে ফেলার অধিকার আমার আছে! একবার অল্প বয়সী চতুর বিধবার মুখেও বলতে শুনেছি— "স্বামী প্রয়াত হবার পরে যখন নতুন করে বিয়ে করেছি তখন আমার অধিকার বোধের সংজ্ঞাটিকে কিন্তু নড়চড় হতে দেব না।" অর্থাৎ নতুন স্বামীর সম্পত্তিতে আমার যেমন অধিকার আছে ঠিক তেমনি প্রয়াত স্বামীর সম্পত্তিতেও একই অধিকার থাকবে; অর্থাৎ আমার অধিকার এখন দ্বিগুণ! বিধবার মুখে তখন উচ্ছ্বসিত হাসি দেখেছি। আবার অবিবাহিতা মহিলাকেও চেম্বারে বলতে শুনেছি— "আমার প্রেমিক বিবাহিত হলেও

তার ভালবাসায় যখন আমার অধিকার আছে; তখন সেই ক্ষেত্রে তার বিবাহিতা স্ত্রীর তার স্বামীর সম্পত্তি ও আয় একা ভোগ করার জন্য অধিকার দাবী করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কিছুদিন আগে এক বিত্তশালী ঘরের অবিবাহিতা মেয়ে নিজের ইচ্ছাতে কম সঙ্গতিসম্পন্ন ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার আগে তার বাবার বিশ্বস্তসূত্রে তার কাছে রাখা গচ্ছিত অর্থ, ঘড়ি ও স্বর্ণালঙ্কার সবই আত্মসাৎ করে তার বিয়ের প্যান্ডেল খরচ, আমোদ আহ্লাদ সবই এই টাকাতেই করে। এর অল্পদিন পরেই কিন্তু তার বাবা মানসিক আঘাতে শয্যাশায়ী হন ও অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে।

তাই মহিলা আইনজীবী রূপে ভাবতে লজ্জা করে যে দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ, নীতি চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে যখন একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে মেয়েরা তাঁদের মানসিকতায় ভোগসর্বস্বতাকে প্রাধান্য দেন তখন ধর্মের দেশ ভারতবর্ষের ঐতিহ্য কি ম্রিয়মান হয়ে যাবে না?

আইনগতভাবে অত্যাচারিত মেয়েদের জন্য তাদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বহু জনকল্যাণমূলক আইন রয়েছে ও আমরাও আশা করবো উপযুক্ত যথার্থ ক্ষেত্রে ওইসব আইনের প্রতিফলন ঘটুক। কিন্তু যে ক্ষেত্রে বিনা কারণে ও বিনা অত্যাচারে উদ্দেশ্যমূলক এবং পরিকল্পিতভাবে প্রতারণার দ্বারা মেয়েরা বিয়ের পর পিত্রালয়ে এসে থেকে যায় শুধুমাত্র খোরপোষ আদায়ের জন্য ও ক্ষেত্রবিশেষে সেই খোরপোষের টাকাতেই মেয়েটির পিত্রালয়ের সংসার চলে তখন কি মনে করতে পারি না যে বধূর নিজের স্বামীর ও তার সংসারের প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ মূল্যহীন মনে করেই বধূটি পরিকল্পিতভাবে তার স্বামীর অর্জিত সম্পত্তির অংশ থেকে ভাগ নেবার জন্যই বিয়ে করেছেন ও শুধু এই একটিমাত্র বিয়েই নয়। আরও বহু বিবাহই তারা করেন পরিকল্পিত ভাবেও প্রতারণার দ্বারা।

বিধবাও আইনসম্মতভাবে দু'বার করে সম্পত্তির অধিকার পেতে পারেন না।

অবিবাহিতা মেয়েরও উচিত অপর বিবাহিতা মহিলার সংসার না ভেঙে দিয়ে অর্থাৎ বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে নিজের ভোগসর্বস্বতার উদ্দেশ্য প্রতিফলন না করা। অবিবাহিতা মেয়েদের বিয়ের আগে তার মা-বাবার কাছে বিশ্বস্ত থাকা চিরদিনই কর্তব্য হওয়া উচিত।

তবে নিবন্ধের শেষে এটুকুই বলবো, অধিকার ও কর্তব্যবোধের ন্যায়নিষ্ঠ বোধ তখনই আসবে যখন মহিলারা সনাতন ধর্মের ভিত্তিতে স্নেহ, মায়া, সেবা, ভালবাসার আদর্শে একে অপরকে গ্রহণ করতে পারবেন নীতিগতভাবে।

তবে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি সামগ্রিক শিক্ষার প্রয়োজন। □

(লেখিকা প্রবীণা আইনজীবী)

দেশভাগে গান্ধীর মৌন নয়, মুখর সম্মতি ছিল

দীনেশচন্দ্র সিংহ

এবছরের ৩১ জানুয়ারি দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় 'মহাত্মা গান্ধীর মানবমুখী সমাজভাবনা ও শিক্ষাভাবনা আজও সমান প্রাসঙ্গিক' প্রতিবেদনে সন্দীপ দাস বিশ্বের কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গান্ধীকে মহাত্মা মহামানব বলেছেন তার বিস্তৃত ফিরিস্তি দিয়েছেন। এসব বহুকথিত বহুপঠিত। এতে নতুনত্ব কিছু নেই।

কিন্তু দেশবাসী জানেন গান্ধী সারাজীবনে দেশবাসীর সঙ্গে দ্বিচারিতা করে গেছেন। হিন্দুস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বৃটিশ ও মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণে জীবন দিয়েছেন। তিনি বৃটিশের দূত বা চর হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এসেছেন বা তাঁকে আনা হয়েছে। যেখানেই শোষক ও শাসক বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের পিস্তল গর্জে উঠেছে, সেখানেই তিনি অহিংসার ঝোলা নিয়ে দৌড়েছেন। বীর সাভারকর ও মদনলাল ধিংড়ার পিস্তল লন্ডনের বুকে যখন গর্জে উঠেছিল, গান্ধী শান্তি ও অহিংসার বুলি নিয়ে সেখানে ছুটলেন এবং তাঁদের সশস্ত্র আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। সে সময় বাংলার বুকে চলছে বিপ্লবীদের সঙ্গে বৃটিশ রাজশক্তির অসম লড়াই। বিপ্লবীরা অকুতোভয়, শাসকগোষ্ঠী ভীত-সন্ত্রস্ত ও মরিয়া শ্বেতাঙ্গ শাসক এবং কৃষ্ণাঙ্গ শাসিতের লড়াইয়ে উভয়পক্ষেই হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। জেল, ফাঁসি এবং দ্বীপান্তরেও বিপ্লবীদের শায়েস্তা করা যাচ্ছে না। গান্ধীর আবির্ভাব ঘটল বাংলায়— বলাবাহুল্য অহিংসার বুলি নিয়ে, কিন্তু বৃটিশের নিষ্ঠুরতা নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি কথা তিনি বললেন না। গান্ধী নাকি দেশ বিভাগের বিপক্ষে ছিলেন। এটি এক আষাঢ়ে গল্প। তাঁর জীবনভরা দ্বিচারিতার মাঝে দেশ বিভাগ সম্পর্কে দ্বিচারিতা সর্বোচ্চ নম্বর পেতে পারে। এ বিষয়ে তিনি একমুখে অনেক কথা বলেছেন। ভারত বিভাজন গান্ধীর দ্বিচারিতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। মুখে তিনি বলেছেন—

(1) I pray that God may not keep me alive to witness Partition.

(2) I am opposed to any division of India. But what can I do?

(3) Let it not be said that Gandhi

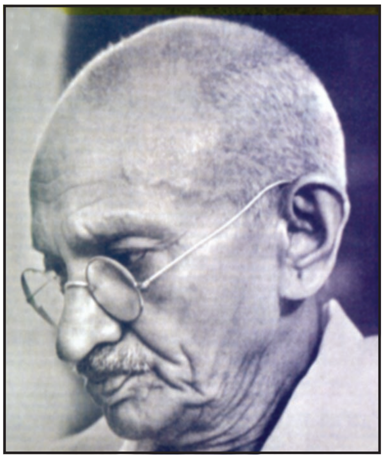

was party to India's vivisection.

(4) Nobody can force me to accept it except God.

কিন্তু গান্ধী তাঁর এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত অবিচল থাকতে পারেননি। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ছেড়ে দিলেন 'পথটা বদলে গেল তাঁর মতটা'। অবশ্য এরকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সকলেরই মত বদলায়। কিন্তু সেটা তিনি যদি দেশবাসীকে ধোঁয়াশায় না রেখে খোলাখুলিভাবে বলে দিতেন তা হলে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারীর মৃত্যুর জন্য দায়ী হতেন না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাষায় তিনি দেশবিভাগের বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সেসব পাঠ করলে মনে হবে দেশবিভাগের বিরুদ্ধে তিনি হিন্দু মহাসভার নেতাদের চেয়েও একপা এগিয়ে রয়েছেন। তার আরও কিছু নমুনা—

(1) Partition means a patent untruth. To assent to such a doctrine is for denial of God.

(2) Vivisect me before vivisect India.

(3) Those who want to devide India are enemies alike of India and Islam.

(4) If the Congress wishes to accept partition, it will be over my dead body. So long as I am alive, I will never agree to the partition of India.

গান্ধীর এসব ছেঁদো কথায় আস্থা স্থাপন করে হিন্দুরা ধনেপ্রাণে মানইজ্জতে মারা গেলেন। ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাজনীতির স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ হিন্দুরা গান্ধীর এসব স্তোকবাক্যে ভুলে রইল, আর গান্ধী ধীরে ধীরে দেশভাগে তাঁর বিরোধিতার খোলস ত্যাগ করতে লাগলেন এবং রাজনৈতিক ডিগবাজির এক বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করে বললেন—

(1) As a man of non-violence, I cannot forcibly resist the proposed partition, if the Muslims of India really insist upon it.

(2) If the eight crores of Muslims desire it (Pakistan), no power on earth can prevent it, notwith standing opposition, violent or non-violent.

(3) The Muslims must have the same right of self-determination that the rest of India has.

তার মর্মার্থ হলো— হিন্দুরা যদি অখণ্ড ভারত দাবী করে, মুসলমানদেরও ভারতকে খণ্ডিত করার দাবী করতে পারে। অহিংসার পূজারী হয়ে তিনি তার বিরোধিতা করতে পারেন না। ভারত ভাগে তাঁর মৌনং সম্মতি নয়, সশব্দ সম্মতি ছিল। ঐতিহাসিকের মতে—

"It is a lie to say that India was divided against his wishes...Taking the greatest political somersault of his life, breaking all post promises, he asked his disciples at the A.I.C.C. meeting on 14th June, 1947 to extend full support to the partition plan...."

গান্ধীর এই বিরাট ডিগবাজীর কারণ আছে। মুসলমানরা হিন্দু- শিখদের খতম করে দেশভাগ করেছে বলেই তাঁর প্রিয় জওহরলাল দিল্লীর গদি দখল করতে পেরেছেন। সেই কৃতজ্ঞতা থেকেই তিনি পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা পাইয়ে দিতে অনশন করেছেন। গান্ধী-নেহরুর ভয় ছিল দেরি হলে কখন সুভাষ বসু এসে পড়বেন।

নেহরুজীও অকৃতজ্ঞ নন। মাথার মুকুটের মতো মোহনদাস করমচাঁদের নামের মুকুট 'গান্ধী' শব্দটি কেড়ে নিয়ে নিজের গোত্র-গোষ্ঠীর মাথায় চাপিয়ে দিলেন। উপাধি চুরির এটাও এক অভিনব দৃষ্টান্ত! যেমন গুরু তেমনি চ্যালা। দু'জনই ডিগবাজী ও দ্বিচারিতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ভারতবাসীর পক্ষে শনি রাহুর যুগ্ম-সম্মিলন। ☐

ভারতবর্ষের যুব-নেতৃত্ব

অতিথি কলম

দত্তাত্রেয় হোসবোলে

দেশে তরুণ নেতৃত্বের প্রয়োজন কথাটা বারবার বলার আগে প্রথমেই এই প্রশ্নটার মীমাংসা জরুরি যে 'তরুণ কে?' তরুণ তরুণ করে দেশে উথাল-পাথাল চলছে। সে প্রসঙ্গে তরুণ মনকে ঠিক করে বুঝে নেওয়াটাই আগে দরকার। নইলে সবই বিফলে যাবে। ভারতকে প্রায়শই তারুণ্যের দেশ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। আর যে ভারত নাকি সুপার পাওয়ার হওয়ার দৌড়ে একেবারে সামনের মারামারিতে। অনেক সময়ই বিশ্বকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত তরুণ নেতৃত্ব উপহার দিয়েছে সত্যি কিন্তু আজকের ভারতে তরুণ নেতৃত্বের রূপ কি হবে সে প্রশ্নই ঘুরে ফিরে আসছে।

স্বামীজী বিজ্ঞান থেকে শুরু করে পরিবেশ, সংস্কৃতি ধর্ম ইত্যাদি কতরকম বিষয়েই না তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর সুচিন্তিত অভিমতগুলি আজও সমাজের অনুপ্রেরণার উৎস। স্বামীজীর চিন্তাধারা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিপ্লবের রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছিল।

তরুণ কে?

যদি বয়সের মাপকাঠিতেই তারুণ্যকে বিচার করাটা আবশ্যিক হয় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ১৯৮৫ সালের ঘোষিত নির্দেশনামা অনুযায়ী ৩৫ বছর বয়স্কদেরই তরুণ ধরা যাবে। এই ক্ষেত্রে উন্নত ও অনুন্নত এই দুটো ভাগে বিশ্বের দেশগুলোকে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী অনুন্নতদের মধ্যে আবার একেবারেই অনুন্নত আর উন্নতি শুরু করেছে এমন বিভাজন করে উভয়ের ক্ষেত্রেই তারুণ্যের সীমা ৪০ বছরে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। যদি, শুধুমাত্র বয়সের বাধ্যবাধকতাটিকেই একমাত্র মাপকাঠি ধরা হয় তাহলে অবশ্য আলোচনা বেশি দূর এগোবে না। তবে অন্য আরও কিছু মানবিক বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রাখলে ব্যাপারটা চোখ ধাঁধিয়ে দেবে।

১৯৭৫ সালে তৎকালীন ভারতের সার্বিক অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে প্রয়াত জয়প্রকাশ নারায়ণ যে সর্বাত্মক বদলের (Complete Transformation) এর ডাক দিয়েছিলেন আর সে ডাকে সাড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ (সেই অর্থে) তরুণ দেশব্যাপী বিক্ষোভ-আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়েছিল তার পুরোধা জয়প্রকাশকে কি তরুণ বলা যাবে? এই আন্দোলনকে ঘিরেই ভারতের রাজনীতিতে উদয় হয়েছিল ঝকঝকে নেতাদের। আবার অতি সম্প্রতি শ্রী আন্না হাজারের সত্যাগ্রহকে ঘিরে দেখা গেছে তারুণ্যের উন্মাদনা ও অংশগ্রহণ। এই দু'জন কি তরুণ নেতার মাপদণ্ডে পড়বেন? আসলে যিনি তরুণদের অনুভূতির কথা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলে তাদের জন্য নিজের মনকেও অনুভূতিপ্রবণ করে তুলতে পারেন তারুণ্যের সংজ্ঞায় তিনি প্রথম আসবেন। শুধু তাই নয়, দেশের তরুণ সমাজের সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থেকে তাদের সঙ্গে সঠিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করার বিশ্বাসযোগ্যতা যাঁর মধ্যে আছে এমন নবীন হৃদয়ের প্রবীণই যথার্থ তরুণ হওয়ার দাবীদার।

মানসিকতায় এমন তরুণ দলের সভ্য হিসেবে প্রথমেই আসবেন বালাসাহেব ঠাকরে বা অটলবিহারী বাজপেয়ীর মতো প্রবাদপ্রতিম নেতারা।

তরুণ কথাটা শুনলেই প্রথমেই মনে আসে এক দল কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে হৈ হৈ করা তরুণ-তরুণীদের। কিন্তু তরুণ কি শুধুই কলেজেই থাকে? না, সারা ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে যুবশক্তি। স্বামীজী যুবশক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন এঁদের আছে 'লোহার পেশী আর ইস্পাতের মেরুদণ্ড।' আদর্শ সমাজ আর জাতি গড়তে যুগে যুগে যুবশক্তি আন্দোলন সংঘটিত করেছে। বেদের সময় থেকেই তরুণদের ওপর আশা-প্রত্যাশা রাখার একটা ঘরানা চালু ছিল। তার সঙ্গে সম্প্রতি রেখেই ইতিহাসে যখনই প্রয়োজন হয়েছে যুবশক্তি যথোপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়ে তাদের ওপর এই আস্থা রাখার যথার্থতা প্রমাণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে মহাভারতের যুদ্ধ তো শ্রীকৃষ্ণ নামের এক বিদগ্ধ যুবকের নেতৃত্বে ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের অমর সেনানী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, মহাত্মা গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ভগৎ সিং যাঁদের নাম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় আজও

উচ্চারিত হয় তাঁরা তো সবাই ছিলেন তারুণ্যের প্রতীক।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র

ভারতেই হোক বা বিদেশে দিন বদলের ডাক বরাবরই দিয়ে এসেছে তরুণরাই। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবী নিয়ে ১৯৮৮-তে চীনের তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে জড় হওয়া যুবকবৃন্দের অনুপ্রেরণা কে ছিলেন? সেই সময় সংবাদ মাধ্যম এত শক্তিশালী ছিল না। ঘটনাস্থলে সমবেত তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার মতোও সঠিক অর্থে কেউই ছিলেন না। তারুণ্যের স্বভাব বৈশিষ্ট্যই তাদের পবিত্র কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করেছিল। খুব সাম্প্রতিক সোমালিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় ঘটে যাওয়া ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল যুবশক্তির সংঘটিত বিপ্লব। এটিকেই কি বলা হবে যুবসমাজের নেতৃত্ব? যে নেতৃত্ব ক্ষমতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ন্যায় ও সুবিচারের লক্ষে বরাবর লড়াই করে এসেছে। এভাবেই তৈরি করেছে শাসক-বিরোধী অবস্থানের শক্তিশালী মঞ্চ।

রাজনীতিতেই কি সব সমাধান?

তবে প্রশ্ন হচ্ছে যে কোনও ক্ষেত্রের অন্যায়, অনৈতিকতা সব কিছুর সমাধানই কি রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে হবে? সমাজের মধ্যেই বিজ্ঞান, পরিবেশ, সমষ্টি উন্নয়ন ইত্যাদি বহু ক্ষেত্র রয়েছে। এখান থেকেই উঠে আসতে পারে একটি সমমনোভাবাপন্ন যৌথ নেতৃত্ব। আমাদের মধ্যে আজকাল একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে কোন সমস্যা মাথা চাড়া দিলেই তার সমাধান রাজনীতির ক্ষেত্রে খোঁজা বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর সবকিছু ছেড়ে দেওয়া। হ্যাঁ, সামগ্রিক ভাবে ব্যাপারটা সরকারের দায়িত্ব হলেও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের সমস্যাগুলি সেই সেই ক্ষেত্রের নেতৃত্বকেই মেটাতে হবে। যেমন ধরুন ক্ষেত-খামার-সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান চাষবাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নেতৃত্বকেই বার করতে হবে। কৃষি নেতৃত্বের বলে দেওয়া পথগুলির সঠিক বাস্তব রূপায়ণের দায়িত্ব ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর বর্তাবে।

স্বামীজী ও নেতৃত্বের প্রশ্ন

কথাটা অনেকেই বলে থাকেন, স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্ব বলতে আধ্যাত্মিক নেতৃত্বই বোঝায়। অথচ স্বামীজী বিজ্ঞান থেকে শুরু করে পরিবেশ, সংস্কৃতি ধর্ম ইত্যাদি কতরকম বিষয়েই না তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর সুচিন্তিত অভিমতগুলি আজও সমাজের অনুপ্রেরণার উৎস। স্বামীজীর চিন্তাধারা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিপ্লবের রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন তরুণ নেতৃত্ব হবে নিঃস্বার্থ, স্বচ্ছ, অনুভূতিপ্রবণ ও ত্যাগী। এই প্রসঙ্গেই জয়প্রকাশ নারায়ণজীর কথা আবার বলতে হবে। তাঁর পরিচালিত যুগান্তকারী আন্দোলনের পর ক্ষমতা দখল হলেও তিনি ক্ষমতা ভোগের জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িত ছিলেন না। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পক্ষান্তরে জেপির বক্তব্য ছিল তাঁর বিক্ষোভ আন্দোলনের ফলে ক্ষমতায় আসা নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে যদি কেউ কেউ দুর্নীতিগ্রস্ত হন তবে তিনি তাঁদেরও বিরোধিতা করতে দেরি করবেন না। ক্ষমতার মোহ থেকে দূরে থাকার আরও উদাহরণ ভারতীয় রাজনীতিতে ছড়িয়ে রয়েছে। লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর ছেলের চাকরীক্ষেত্রে পদোন্নতি হয় আর মাইনেও বেড়ে যায়। শাস্ত্রীজী খবরটা পেয়ে ছেলেকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে বলেন। ছেলে নানারকম স্বাভাবিক যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করায় শাস্ত্রীজী কথা না বাড়িয়ে তাঁকে বলেছিলেন সেক্ষেত্রে তাঁকেই (শাস্ত্রীজীকে) পদত্যাগ করতে হবে। ক্ষমতার সঙ্গেই আসে প্রলোভন, প্রাচুর্যের হাতছানি। সত্যিকারের নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব এমনই হতে হবে। পরিবর্তনের হাত ধরেই আসে ক্ষমতা। ক্ষমতার অপপ্রয়োগ বিপ্লবের আগুনকে অচিরেই নিভিয়ে দেয়।

দেশে দেশে

বিক্ষোভ আন্দোলনই তৈরি করে নেয় তার নেতাকে। উঠে আসে নেতৃত্বের মুখ। তিনিই হন নেতা। কিন্তু এটি ছুরির ওপর দিয়ে হাঁটা। ইন্দোনেশিয়ায় বিক্ষোভ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জন্ম হয়েছে নেতারা। কিন্তু মানুষ তার প্রত্যাশা মেটাতে বারবার নতুন বিক্ষোভের মাধ্যমে তাদের নেতা বদল করেছে কেননা এ আগে বলা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে উঠে আসা নেতৃত্ব ক্ষমতায় এসে স্বচ্ছতা, নৈতিকতা আর ধরে রাখতে পারেনি। বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে ২৬ বছর জেলবন্দী নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন কিন্তু তিনি আন্দোলনের সময় দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলি থেকে কখনও সরে আসেননি। পোল্যান্ডের শ্রমিক নেতা লেচ ওয়ালেসা গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা তিনি পাননি। কারণগুলি সহজেই অনুমেয়।

নেতার প্রয়োজনীয়তা

একটি বিশেষ আদর্শ বা অন্যায়ের প্রতিকার করার প্রাথমিক প্রেরণা থেকেই বিক্ষোভ, প্রতিবাদ বা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হলেও প্রতিটি আন্দোলনই খুঁজে নেয় তার নিজস্ব মুখ। একেবারে সাম্প্রতিক উদাহরণ আন্না হাজারে। নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠায় সফলকাম এই সাদামাটা প্রবীণ ব্যক্তিত্বকে ঘিরে তারুণ্যের এক নতুন জাগরণ দেখা গেল। আবার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এখনও রয়েছে যারা দীর্ঘ কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে নিজেরাই হয়ে উঠেছে একএকটি আদর্শের মুখ— যেমন জ্ঞান প্রবোধিনী বা বিদ্যাভারতী সংস্থা এমন কয়েকটি। এরা যুবশক্তিকে সঠিক পথে দিশা দেখাতে সক্ষম। প্রচলিত পরিকাঠামোর পরিবর্তনে দরকার নির্দিষ্ট দিশা। দেশ আজ যথার্থ নেতৃত্বহীনতায় ভুগছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই আজ সময় হয়েছে ফিরে তাকাবার। মাত্র দুই বা তিনটি প্রজন্মের আগে কেমন ছিল তাদের নেতৃত্বের মুখ। আজকের সঙ্গে তাদের ফারাক কত?

বর্তমান পরিস্থিতি

তবুও আজকের পরিস্থিতি দেখে আমি আদৌ হতাশ নই। আমার মাতৃভূমির প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। অতীতে আমাদের পুণ্যভূমি থেকেই উঠে এসেছেন মহারানা প্রতাপ, শিবাজী মহারাজ, মহাত্মা গান্ধী, সর্দার প্যাটেল, রাজগুরু, ভগৎ সিং, রাণী লক্ষ্মীবাঈ এর মত স্মরণীয় গণনায়করা। এঁদেরই রক্তস্রোত প্রবাহিত আমাদের তরুণদের ধমনীতে। তাই আগের প্রসঙ্গটিতে ফিরে এসে বলি, বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতি পরিবর্তনের আন্দোলনে কোনও নেতার মুখ জরুরি হলেও হয়তো অপরিহার্য নয়। মানুষ নেতায় বিশ্বাস হারালেও লক্ষ্যবস্তুতে স্থির আছে। অবস্থা পালটাতে হবে। বিক্ষোভের কারণ এবং যুক্তিযুক্তভাবে সবাই একমত। তাই এক যৌথ নেতৃত্বের উত্থান অবশ্যম্ভাবী আর তা হয়তো আগামী দশকেই। ❑

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ)

ভারতীয় চলচ্চিত্রের শতবর্ষের প্রাক্কালে

দাদাসাহেব ফালকে

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি বাংলার প্রবীণতম কর্মক্ষম অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় চলচ্চিত্র শিল্পের সর্বোচ্চ সম্মান দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত হলেন। যোগ্য মানুষটির হাতেই যে শ্রেষ্ঠ সম্মানটি অর্পিত হলো তা সন্দেহাতীত। আমাদের দেশে চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, সাহিত্য, বিজ্ঞান, খেলাধুলোর মতো বহু বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হিসেবে নানান সরকারি খেতাব দেওয়া হলেও (পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ইত্যাদি), অনেক সময়ই তার যৌক্তিকতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে খানিকটা তর্ক-বিতর্ক হয়। কিন্তু শুরু থেকে আজ অবধি এই একটিমাত্র পুরস্কার যার যোগ্যতা নির্ণায়ক মাপকাঠি নিয়ে সম্মানটি আজও বিতর্কহীনভাবে শ্রেষ্ঠ শিরোপা। এমন একটি উচ্চকোটির সম্মান যে ব্যক্তির নামে প্রদত্ত হয় তাঁর সম্পর্কে কিন্তু প্রচার- পরিচিতি তুলনামূলক ভাবে সীমিত। কথাটা এই কারণেই বলা যে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প আজ শতবর্ষ পূর্তির দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষমান। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে ৩রা মে ১৯১৩ সালে ঢুন্ডিরাজ গোবিন্দ ফালকে পরিচালিত 'রাজা হরিশচন্দ্র' নামের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্রটি তৎকালীন বোম্বের করোনেশন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। এই দিনটি তাই ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্মদিন বলে গৃহীত। অনেকগুলি শিল্পশাখার সফল সংমিশ্রণে তৈরি চলচ্চিত্র শিল্পের মতো এমন অনিশ্চয়তায় ভরা শিল্পমাধ্যম পৃথিবীতে আর বিশেষ নেই। অথচ এই শিল্প মিশ্রণটিকে পূর্ণতা দিতে গেলে অর্থের সংস্থান এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়। দাদাসাহেবের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বাড়তি ছিল তখনকার সামাজিক পরিবেশ। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত চলচ্চিত্রের ইতিহাসেই এটা দেখা গেছে রূপালি পর্দার মায়া একবার জড়িয়ে গেলে তার থেকে বেরোনো ভীষণ মুশকিল। মহারাষ্ট্রের মানুষ ফালকে মারাঠী নাটকের একজন নিয়মিত লেখক ও অভিনেতা ছিলেন। কিন্তু তখনকার দিনে (বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে) শর্ট ফিল্ম, আমদানি করা বিদেশী কিছু টুকরো ছবি প্রদর্শিত হলেও কাহিনীচিত্র বলতে যা বোঝায় তা আমাদের কিছু ছিল না। অথচ নাটকের ফালকে তখন একেবারে দেশজ কায়দায় তৈরি দেশের মানুষের রুচির সঙ্গে খাপ খাইয়ে কাহিনীচিত্র তৈরি করতে মরিয়া। তাই ফিল্ম- টেকনিক আয়ত্ত করতে তাঁর বিমার পলিসিগুলি বাঁধা রেখে চলে যান তখনকার ফিল্মের পীঠস্থান লন্ডনে। ওখানকার স্টুডিওয় ঘোরাফেরা করে হাতেকলমে সড়গড় হন, আর কিনে ফেলেন কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। মহানন্দে দেশে ফিরে সঙ্গে সঙ্গে হাত লাগান সঠিক অর্থেই ষোল আনা ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী চিত্র 'রাজা হরিশচন্দ্রে'র নির্মাণে। কিন্তু কড়া সামাজিক বিধিনিষেধ। রাজা জুটলেও রাণী তারামতী হবেন কে? স্ত্রী অভিনেত্রী বাড়ন্ত। স্বভাবসিদ্ধভাবেই দমলেন না ফালকে। তাঁর শ্যুটিং-এর হেল্পারকে শাড়ী, সায়া, ব্লাউজ পরিয়ে তারামতী বানিয়ে নামিয়ে দিলেন।

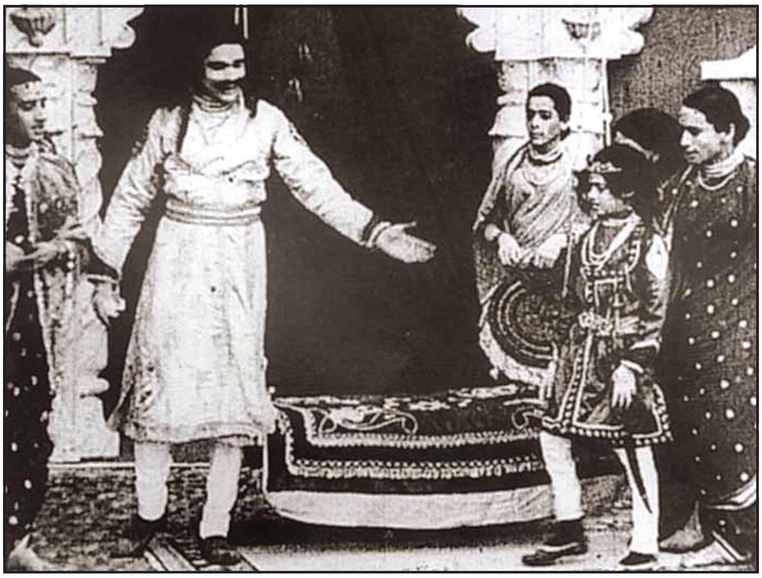

রাজা হরিশচন্দ্র চলচ্চিত্রের (১৯১৩) একটি দৃশ্য।

এখানেও শেষ হলো না গল্পের। সিনেমায় নামার মতো হীন কাজ তখনকার সমাজপতিরা আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পেতেন না। তাই রাজারাণী পাওয়া গেলেও রাজপুত্তুর কে হবে? দেরি না করে অপ্রতিরোধ্য ফালকে নিজের ছেলে ভালচন্দ্রকেই রাজকুমার সাজালেন। ব্যাস, আর

পেছন ফেরেননি ভারতীয় চলচ্চিত্রের পুরোধা পুরুষ। হৈ হৈ করে চলল ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র 'রাজা হরিশ্চন্দ্র'। তৃষ্ণার্ত ভারতীয় দর্শককুল পেল গল্পের স্বাদ। যে গল্পের শাখা-প্রশাখা আজ ভারতীয় চলচ্চিত্রকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একটি বিপুল চাহিদার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সফল পণ্যের মর্যাদা এনে দিয়েছে।

এই সুবাদেই আজ অর্থের প্রাচুর্য এসেছে ভারতীয় চলচ্চিত্রে। অনেক চিত্র নির্মাতাই ছবির চাকচিক্য বাড়াতে বিদেশের বনে-জঙ্গলে, জলে-স্থলে গিয়ে শ্যুটিং করছেন। আজ থেকে ২/৩ দশক আগে থেকেই সবিশেষ তদবির তদারকি করে দেশের মানুষকে অনেকসময় দেখার সুযোগ না দিয়েই কিছু কিছু পরিচালক তাঁদের ছবি বিদেশের চলচ্চিত্র উৎসবগুলিতে দেখাতে অস্থির হয়ে পড়তেন। সেখানেও চলতে থাকে যাকে বলে লবিবাজি। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী, অপরাজিত, জলসাঘর দিয়ে ভারতকে বিশ্ববাসীর চেনার যে উৎস খুলে যায়, অনেক হেঁজি-পেঁজিরাও হঠাৎ বিখ্যাত হতে ছবি নিয়ে ছাড়পত্র পেতে কর্তৃপক্ষের হাতে পায়ে পড়তেন। অথচ একটু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে সেই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফালকের মূক চলচ্চিত্রগুলি বিদেশের গুণীজনদের কাছে কী সমাদরই না পেয়েছিল। 'হরিশ্চন্দ্রে'র পর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তিনি নায়িকা সংগ্রহে সফল হন। তৈরি হয়ে যায় 'মোহিনী ভস্মাসুর' ও 'সাবিত্রী সত্যবান'-এর মতো আরও দুটি সফল পৌরাণিক গল্পের চলচ্চিত্র। সিনেমা-পাগল ফালকে ছবির বাড়তি প্রিন্ট তৈরি করার বিশেষ মেশিন কিনতে আবার বিলাতযাত্রা করেন। এই ১৯১৪ সালের যাত্রার সঙ্গে নিয়েছিলেন নিজের তৈরি আগে চলা তিনটি ছবিকে। আজকের তদবিরপন্থীদের অবগত হওয়া ভাল তখনকার লন্ডনের 'বাইস্কোপ উইকলি' লন্ডনের ফিল্ম পত্রিকাগুলিতে তাঁর ছবিগুলির অগ্রিম প্রশংসা ছাপায়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করে দেয় কয়েকটি বাণিজ্যিক প্রদর্শনেরও। মনে রাখতে হবে তিনি গিয়েছিলেন এক পরাধীন দেশের অতি সাধারণ চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে। যিনি কলাকুশলী ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির জন্য ছিলেন একান্তই পরনির্ভরশীল। ফালকে-কে অবাক করে ছবির প্রদর্শনের পর বিখ্যাত পত্র-পত্রিকাগুলিতে তাঁর

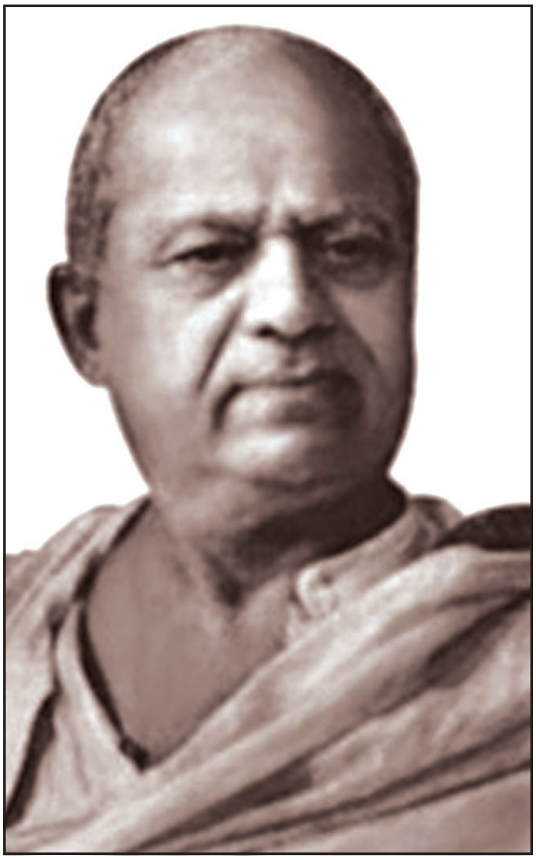

ছবির বিষয়বস্তুই শুধু নয়— নতুন যন্ত্রপাতি নিয়ে যে প্রায়োগিক নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন তারও ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

শুনলে অবাক লাগে সেই ১০০ বছর আগের একটি উপনিবেশিক দেশের এই মানুষটিকে বৃটিশ চলচ্চিত্র নির্মাতারা সেদিন বৃটেনে থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ করার খোলা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আদ্যন্ত ভারতীয় ভাবনায় উদ্বুদ্ধ ফালকে সাহেব তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে দেশে ফিরে আসেন। ফিরে আসেন হৃদয়ের টানে। প্রসঙ্গান্তরে মনে পড়ে যায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের আর এক মহীরূহ সত্যজিৎ রায়ের প্রত্যাবর্তনের কথা। বম্বেতে 'শতরঞ্জ কী খিলাড়ী'র নির্মাণের পর অজস্র আমন্ত্রণ আসতে থাকে ওখানে থেকে ছবি করার। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকুশলীদের দেখে সত্যজিৎও যথেষ্ট অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনস্থির করলেন — না। তাঁর অস্তিত্বের শেকড় টালিগঞ্জে। অবলীলায় ফিরে এলেন কলকাতায়। তৎকালীন টালিগঞ্জের স্টুডিওগুলির নড়বড়ে যন্ত্রপাতি ও সেকেলে পরিবেশেই ছড়িয়ে গেলেন একের পর এক অক্ষয় মণি-মুক্তো।

ফালকে সাহেব ফিরে এসেও অবস্থার কোনও সুরাহা দেখতে পাননি। সেই ১৯১৪ সালে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মধ্য গগনে। সিনেমার কাঁচামাল আমদানি করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল বা প্রায় অসম্ভব। হাল ছাড়েননি। অপেক্ষার পর ১৯১৭-য় কষ্টেসৃষ্টে আবার পৌরাণিক কাহিনী 'লঙ্কাদহন'। তারপর এল 'কৃষ্ণের জন্ম', 'কালীয় দমন'। ফালকে হেঁটে চললেন পৌরাণিক কাহিনী বলার অন্তহীন পথ। কাহিনীপ্রিয় ভারতবাসী পেয়ে গেল তাদের প্রিয় ছবিওয়ালাকে।

এই কাহিনীর ট্র্যাডিশন আজও অপ্রতিহত। কখনও তা সামাজিক, কখনও ঐতিহাসিক, কখনও বা পৌরাণিক। ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিশ্বব্যক্তিত্ব সত্যজিৎ রায়ও তাঁর সৃজন সৌন্দর্যময় তাবৎ ছবিগুলিতে বিভিন্ন আঙ্গিকে সেই কাহিনীর ধারাকেই বহমান রেখেছেন। যুগান্তকারী 'পথের পাঁচালী 'থেকে অন্তিম 'আগন্তুক'-এর গল্পেও নায়িকার মামা, এই ভণ্ড ভদ্রসমাজের মুখোশ খুলে দেওয়ার টানটান গল্পটিই শুনিয়ে গেছেন। ফালকের দেখানো কাহিনীচিত্রের রাজপথ আলোকিত করতে পরবর্তী প্রজন্মের প্রয়াত রাজ কাপুর, শান্তারাম, রমেশ সিপ্পী, এম জি আর রামারাও থেকে করণ জহর, সঞ্জয় লীলা বনশালীরা ট্র্যাডিশান ধরে রাখতে আজও যত্নবান। হালফিল সুজিত ঘোষের বহু প্রশংসিত বিদ্যা বালানের 'কাহানীর' অসাধারণ সাফল্য তো আজ নিজেই এক কাহিনী। ভারতীয় চলচ্চিত্রের শতবর্ষের লগ্নে অগ্রপথিক দাদাসাহেব ফালকে-কে প্রণাম। ▯

তালিবানী আফগানিস্তানের পথে বাংলাদেশ

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ 'বাংলাদেশে ইসলামি মৌলবাদী অর্থনীতির এখন বার্ষিক মুনাফা আনুমানিক দুই হাজার কোটি টাকা। ব্যাঙ্ক, বীমা, লিজিং কোম্পানি, বেসরকারি সংস্থা (২৩১টি), বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ওষুধ শিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রিয়েল এস্টেট ব্যবসা, সংবাদমাধ্যম, তথ্যপ্রযুক্তি, পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবসাসহ বিভিন্নভাবে তারা তাদের অর্থনীতিতে দাঁড় করিয়েছে। যেখানে মূল স্রোতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বছরে গড়ে ৫ থেকে ৬ শতাংশ সেখানে মৌলবাদীদের আর্থিক প্রবৃদ্ধির হার বছরে গড়ে ৭ দশমিক ৫ থেকে ৯ শতাংশ। এক্ষেত্রে

পাকিস্তানের ধর্মান্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের জন্ম। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই ও মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে নবজাত বাংলাদেশকে পথ দেখায়। কিন্তু 'এক নদী রক্তের বিনিময়ে' স্বাধীনতা এলেও সমাজ ও রাজনীতি থেকে ধর্মান্ধতা মুছে ফেলা যায়নি।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে দিন দিন অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ বৃদ্ধি পাবে সে কথা বলার আর অবকাশ রাখে না; বাংলাদেশে মৌলবাদী নিয়ে গবেষণা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি আবুল বারকাত। এই বিশ্লেষণ তাঁরই। তিনি সম্প্রতি শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় জাহানার ইমাম স্মারক বক্তৃতায় ওই বক্তব্য তুলে ধরেন।

অধ্যাপক বারাকাতের মতে, বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা উগ্র রূপ ধারণ করেছে। এই সাম্প্রদায়িকতা— অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ, উভয় শক্তির মাধ্যমে 'অর্থনৈতিক ক্ষমতাভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করে সুসংগঠিত সশস্ত্র জঙ্গি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে উদ্যত। তারা সৃষ্টি করেছে মূল ধারার অর্থনীতির মধ্যে আরেকটি অর্থনীতি। ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের এই কৌশল ধর্মীয় ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত।...বাংলাদেশে বর্তমানে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি যে মাত্রা নিয়েছে তাতে এ সংকট নিরসনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও কালক্ষেপ মহাবিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

পাকিস্তানের ধর্মান্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের জন্ম। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই ও মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে নবজাত বাংলাদেশকে পথ দেখায়। কিন্তু 'এক নদী রক্তের বিনিময়ে' স্বাধীনতা এলেও সমাজ ও রাজনীতি থেকে ধর্মান্ধতা মুছে ফেলা যায়নি। দেশশাসনে সরকারের ব্যর্থতা, দেশজুড়ে অব্যবস্থা, লুঠপাট এমন ভাবনার বীজ উপ্ত করে--- পাকিস্তানই ভালো ছিল। যে ভারত দুর্দিনে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে, ভারতীয় সেনাবাহিনী রক্ত ঢেলে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় সহজ করেছে, গোটা ভারতবাসী এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে বাড়তি ব্যয় বহন করেছে, সেই ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো শুরু হয়ে গেল সুকৌশলে। মুজিব সরকারের ব্যর্থতার দায় চাপলো ভারতের ঘাড়ে। এর মধ্যে হঠাৎ ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিব ইসলামি সম্মেলনে যোগ দিতে লাহোর ছুটে গেলেন। পাকিস্তান এর আগে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি, শুধুমাত্র ইসলামি সম্মেলনে শেখ সাহেবকে নিয়ে যাওয়ার কৌশল হিসেবে তড়িঘড়ি স্বীকৃতি দিল স্বাধীন বাংলাদেশকে। পাশাপাশি কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবকেও জিইয়ে রাখলো। সাংবিধানিকভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশের সরকার-প্রধান এভাবে ইসলামি সম্মেলনে যেতে পারেন না, তাজউদ্দিন

আহমেদ (একাত্তরে বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী) সহ মন্ত্রিসভার কেউ কেউ এ ব্যাপারে শেখ সাহবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তাঁর একগুঁয়েমির কাছে সবাই পরাস্ত হলেন। আর বাংলাদেশে ইসলামি মৌলবাদী শক্তির তখন বলতে গেলে পোয়াবারো। এই এক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত ইসলামি শক্তি উজ্জীবিত হয়ে উঠলো।

তারপরের ইতিহাস ধর্মান্ধ পরাজিত শক্তির দ্রুত মহীরুহে পরিণত হয়ে ওঠার কাহিনী। শেখ মুজিব সৌদি আরবসহ ইসলামি দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার পদক্ষেপ নিয়েও আত্মরক্ষা করতে পারেননি। দ্বিতীয় পাকিস্তান বানানোর লক্ষ্যে পরিচালিত ষড়যন্ত্রে তাঁকে প্রাণ দিতে হলো সপরিবারে। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি ইসলামি ধর্মান্ধ শক্তির। এক সামরিক অভ্যুত্থানে মুজিব হত্যার পর তারই ঘনিষ্ঠ সহযোগী খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ক্ষমতা হাতে নিলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশনের ঘোষণা করার প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। কিন্তু তদানীন্তন ভারতীয় হাইকমিশনার সমর সেন একদিন সকালে খন্দকারের সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে দেন, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তন যাই ঘটুক পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে ভারত মানবে না। যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে। তৎকালীন বঙ্গভবনে খন্দকারের পার্ষদরা বলেছেন, সমর সেনের এই হুমকিতে খন্দকার হতাশ হয়ে পড়েন, আর কনফেডারেশনের কথা কখনও উচ্চারণ করেননি। অভ্যুত্থানের নায়করাও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন।

পরবর্তী সময়ে ইসলামিকরণের প্রয়োজনীয় ধাপগুলো সম্পন্ন করেছেন দুই সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ও হুসেন মহম্মদ এরশাদ। রাজনীতিকরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৌলবাদে প্রত্যাবর্তনে মদত দিয়েছেন। বিএনপি আওয়ামি লিগ দুই আমলেই বাংলাদেশে ইসলামের নামে

ব্যাংকের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, বীমার অনুমতি মিলেছে। অগুনতি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। অনুমোদন মিলেছে সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেল, কয়েকশ বেসরকারি সংস্থার, ইসলামের নামে। গড়ে উঠেছে ইসলামি হাসপাতাল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। আর মাদ্রাসা? সে তো হাজার হাজার। প্রয়াত অধ্যাপক কবীর চৌধুরীসহ কয়েকজন শিক্ষাবিদ বলেছেন— জঙ্গি তৈরির কারখানা। পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে গভীর জঙ্গলে মধ্যপ্রাচ্যের তহবিলে যেসব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে জঙ্গি প্রশিক্ষণ চলে। এখান থেকে জঙ্গিরা যুদ্ধ করতে যায় কাশ্মীর, আফগানিস্তানে। পুলিশী অভিযানে কিছু জঙ্গি ধরাও পড়েছে। এভাবেই তৈরি হয়েছে মৌলবাদী নেটওয়ার্ক ও অর্থনীতি। খোদ খালেদা জিয়ার চার দলীয় জোটের অন্যতম শরিক ইসলামি ঐক্যজোটের নেতা ফজলুল হক আমিনী প্রকাশ্যেই বলেন, ‘আমরা হব তালেবান, বাংলা হবে আফগান’। রাষ্ট্রবিরোধী হলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি।

দুই সামরিক শাসক বাহাত্তরের সংবিধানকে ইসলামি সংবিধানে রূপান্তরিত করেছেন। জিয়াউর রহমান সংবিধানের সূচনায় বিসমিল্লাহ যোগ করেছেন, মূল নীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করেছেন। এরশাদ রাষ্ট্রধর্ম করেছেন ইসলামকে। সর্বোচ্চ আদালত এক মামলার প্রেক্ষিতে সামরিক শাসন অবৈধ ঘোষণা করেছে এবং রায় দিয়েছে, সংবিধানের মূল নীতি পরিবর্তন করা যায় না। ফলে পুনঃস্থাপিত হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। আদালতের রায়ের পর বর্তমান আওয়ামি লিগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধন করেছে বটে, কিন্তু বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আওয়ামি লিগও এক সময় মৌলবাদী দলগুলোর সঙ্গে আঁতাত গড়েছিল, দেশজুড়ে তীব্র প্রতিবাদের মুখে পিছিয়ে আসে।

এভাবেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয়েছে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ। মজবুত হয়েছে তাদের অর্থনীতি। ❑

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

সবার আগে আমেরিকাবাসী মূল ভারতীয়রাই

সংবাদদাতা॥ আমেরিকাবাসী মূল ভারতীয়রাই (NRI) সেদেশে সর্বাধিক উপার্জনকারী এবং শিক্ষিত— এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় এরকমই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। সমীক্ষকরা কেউই কিন্তু ভারতীয় নন। আমেরিকাবাসী এশীয়দের কথা ধরলে তারা সবাই মিলে উন্নতিশীল সমাজ হিসেবে লাতিনিয়ানদের পিছনে ফেলে দিয়েছেন জাতিগোষ্ঠী হিসেবে।

সবমিলিয়ে এই এশীয় জাতিগোষ্ঠীভুক্ত আমেরিকাবাসীরা আবার মূল আমেরিকানদের তুলনায় অধিক উপার্জনকারী এবং অধিক শিক্ষিত। এই সমীক্ষা প্রকাশ করেছে পেউ রিসার্চ সেন্টার (Pew Research Centre)। রিপোর্টের শীর্ষকই হলো— ‘‘দি রোজ অফ্ এশিয়ান আমেরিকানস্’’। প্রকাশিত হয়েছে গত ২০ জুন।

আমেরিকায় ভারতীয়দের সংখ্যা এসময়ে প্রায় ৩.১৮ মিলিয়ন— তৃতীয় সর্বাধিক। এর উপরে রয়েছে— চীনারা— চার মিলিয়ন, ফিলিপাইনবাসী ৩.৪ মিলিয়ন। মূল ফিলিপাইনের আমেরিকাবাসীরা সর্বাধিক বার্ষিক ৮৮,০০০ ডলার রোজগার করেন। অন্যান্য মূল এশিয়ান আমেরিকানদের রোজগার গড়ে ৬৬,০০০ ডলার। সেক্ষেত্রে মূল আমেরিকানদের গড় আয় বার্ষিক ৪৮ হাজার ডলার।

মূল ভারতীয় আমেরিকানদের প্রতি দশজনের মধ্যে সাতজন ভারতীয়ই কমপক্ষে স্নাতক। এটা এশিয়ান আমেরিকানদের তুলনায় বেশি (৪৯ শতাংশ)। অথচ সবমিলিয়ে আমেরিকার জাতীয় গড় ২৮ শতাংশ মাত্র।

ভারতীয় মূলের আমেরিকাবাসীদের অর্ধেকেরও বেশি (৫৭ শতাংশ) মানুষের নিজস্ব বাসস্থান আছে। এখানে সব মিলিয়ে ৫৮ শতাংশ এশিয়ানদের এবং ৬৫ শতাংশ আমেরিকানদের নিজস্ব বাসস্থান আছে। আমেরিকানদের মধ্যে সব মিলিয়ে গরীব মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ। এশীয় আমেরিকানদের ১২ শতাংশ, আর মূল ভারতীয়দের মাত্র ৯ শতাংশ গরীব। পিতা হিসেবে ৭৮ শতাংশ মূল ভারতীয় আমেরিকাবাসীই ভালো। এটা আমেরিকার সমাজব্যবস্থায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ দিক। ৬৯ শতাংশ মূল ভারতীদের পারিবারিক বন্ধন খুবই দৃঢ়। এখানে আমেরিকানদের পরিমাণ মাত্র ৮ শতাংশ।

রাজনৈতিক ভাবাদর্শের বিষয়ে এশীয় এবং ভারতীয় মূলের আমেরিকাবাসীদের শতকরা ৬৫ জনই ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমর্থক, ১৮ শতাংশ রিপাবলিকানদের সমর্থন করেন। ৬৫ শতাংশ মূল ভারতীয়ই রাষ্ট্রপতি ওবামার রোজগার বা কর্মবিনিয়োগ নীতিকে সমর্থন করেন, ২২ শতাংশ করেন না।

বসবাসের দৃষ্টিতে ২৪ শতাংশ ভারতীয় পশ্চিম আমেরিকার বাসিন্দা, এখানে থাকেন এশিয়ার মূল নিবাসীদের ৪৭ শতাংশ মানুষ। যেখানে আমেরিকানদের সংখ্যা ২৩ শতাংশ। প্রতি দশজনের মধ্যে তিনজন ইন্দো-আমেরিকান (৩১ শতাংশ) উত্তর-পূর্ব আমেরিকায় বসবাস করেন। ২৯ শতাংশ দক্ষিণে এবং বাকী ১৭ শতাংশ মধ্য-পশ্চিম আমেরিকায় বসবাস করেন। প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জন সাবালক ভারতীয় আমেরিকাবাসীর জন্ম বিদেশে, এই সংখ্যাটা এশীয়দের ৭৪ শতাংশ এবং সবমিলিয়ে সাবালক আমেরিকানদের ১৬ শতাংশ।

আমেরিকাবাসী ভারতীয়দের অর্ধেকের বেশিই (৫৬ শতাংশ) আমেরিকান নাগরিক। এখানেও সাবালক মূল এশীয়দের ৭০ শতাংশেরই আমেরিকার নাগরিকত্ব আছে।

আমেরিকাবাসী ভারতীয়দের তিন-চতুর্থাংশই সাবলীলভাবে ইংরেজী বলতে পারেন। এই সংখ্যাটা মূল এশীয়দের ক্ষেত্রে ৬৩ শতাংশ এবং মূল আমেরিকানদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই ইংরেজীতে সাবলীল।

আমেরিকাবাসী সাবালক ভারতীয়দের দশজনের মধ্যে সাতজনই (৭১ শতাংশ) বিবাহিত। এশিয়ার মূল-নিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫৯ জন বিবাহিত আর আমেরিকার জাতীয় গড় ৫১ শতাংশ। ভারতীয়দের মধ্যে কুমারী মায়েদের সংখ্যা ২.৩ শতাংশ, মূল এশীয়দের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ এবং সার্বিকভাবে আমেরিকানদের মধ্যে ৩৭ শতাংশ কুমারী-মা। আমেরিকায় ভারতীয় মূলের অধিবাসীদের (সাবালক) গড় বয়স ৩৭ বছর, এশীয়দের ৪১ বছর এবং আমেরিকানদের সার্বিক গড় ৪৫ বছর। ▯

বিশ্ব ও ইউরো সেরা হলেও সেকালের ব্রাজিলের সমকক্ষ নয় স্পেন

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইউরো-জয়ী স্পেনের ফুটবল টিম।

প্রত্যাশা মতোই ২০১২ ইউরো কাপ জিতল স্পেন আপন নন্দন মাধুরী শৈলীতে। এই মুহূর্তে বিশ্বের সব উন্নত ফুটবল শক্তির তুলনায় টেকনিক্যাল ও ট্যাকটিক্যাল দক্ষতায় অনেকটাই এগিয়ে আছে স্পেন। না হলে চার বছরে দুটো ইউরো, একটা বিশ্বকাপ জেতা সম্ভব নয়। একইভাবে স্পেনের ক্লাব বার্সেলোনা এই চার-পাঁচ বছরে একাধিকবার ইউরোপ ও বিশ্বসেরা ক্লাবের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। আরও তিন-চার বছর স্পেন ও বার্সেলোনার এই দাপট চলবে দুনিয়া জুড়ে। তা বলে অনেক বিশেষজ্ঞ এই স্পেনকে সর্বকালের সেরা দল বলে প্রতিষ্ঠিত করতে যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছেন, তার সঙ্গে সহমত হওয়া সম্ভব নয় কোনও যুক্তিতেই।

ফিফা গত একশো বছরের সেরা দল হিসেবে ১৯৫৮-৭০ এই বারো বছরের ব্রাজিল দলটিকে বেছে নিয়েছে। যদিও ১৯৫৮ ও ৬২ এই বিশ্বকাপ দুটিতে চ্যাম্পিয়ান হওয়া ব্রাজিলের অনেক খেলোয়াড়ই ১৯৭০-এর বিশ্বকাপে ছিলেন না। প্রায় নতুন দল নিয়ে মেক্সিকোর মাটিতে অবতীর্ণ হয়ে ব্রাজিল কাপ জিতে ইতিহাস সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সোনার তৈরি জুলে রিমে কাপটিকে চিরকালের মতো হস্তগত করে। পেলে, জর্জিনহোর মতো ২/৩ জন পুরোনো ফুটবলার ব্যতীত জেয়ারজিনহো, রিভেলিনো, টোস্টাওর মতো জিনিয়াস অথচ কয়েক বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের দিয়ে মেক্সিকোয় বাজিমাত করেছিলেন কোচ মারিও জাগালো। যিনি আবার ১৯৫৮/৬২ দুটি চ্যাম্পিয়ান দলেই ছিলেন খেলোয়াড় হিসেবে। এই কৃতিত্ব কারুর নেই বিশ্বে।

কি বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল ওই সময়ের ব্রাজিল দলটিতে? এককথায় বিশ্লেষণ করতে বসলে বলতে হয় কি ছিল না ওই দলটির! সর্বোচ্চ মানের স্কিল, টেকনিক, রক্ষণ, মাঝমাঠ আক্রমণভাগের মধ্যে চমৎকার সমন্বয়, পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলার স্টাইল বা ধরন পাল্টে ফেলার যাদুকরী দক্ষতা, মাঠের সব অঞ্চলকে নিখুঁতভাবে ব্যবহার করা, জমি ও শূন্যে বলের ওপর পজেশন ও পজিশন জারি রাখার অবিস্মরণীয় কৌশলগত উৎকর্ষ যা দেখে তৎকালীন বিশ্বসভ্যতা বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিল। ব্রাজিলের 'ক্লাসিক' ও ডিজাইন' ফুটবল দেখে বহু কবি, শিল্পী, দার্শনিক এর নাম দিয়েছিলেন 'জোগা বোনিতো' অর্থাৎ স্বর্গীয় সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর এক রূপকল্প। স্বাধীনোত্তরকালে ভারতীয় হকি, নব্বইয়ের দশকের মার্কিন বাস্কেটবল টিমই কেবল এই ব্রাজিলের সঙ্গে তুলনায় আসতে পারে। প্রায় এক দশক ব্রাজিলকে সমস্যায় ফেলতে পারেনি কোনও দেশ।

আর খেলোয়াড় সাপেক্ষে ব্যক্তিগত উৎকর্ষের মানদণ্ডে ব্রাজিলের পেলে, গ্যারিঞ্চা, ভাবা, ডিডি, দুই স্যান্টোস বা পরবর্তীকালের জেয়ারজিনহো, টোস্টাওরা অনেক এগিয়ে থাকবেন বর্তমান স্পেনের ফুটবলারদের তুলনায়। ওই ব্রাজিল দলের প্রত্যেক ফুটবলারই ছিলেন টোটাল অলরাউন্ড ফুটবলার। স্পেনের এই ফুটবলাররাও যদিও বিখ্যাত তাত্ত্বিক কোচ নেদারল্যান্ডের রেনাস মিশেলের অনুসৃত উত্তর আধুনিক স্ট্রাটেজি অর্থাৎ ডায়মন্ড ফুটবলই খেলছে, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষে সমকক্ষ নয় ব্রাজিলের স্বর্ণযুগের ফুটবলারদের সাপেক্ষে। এমনকি পঞ্চাশ দশকের পুসকাসের হাঙ্গেরিও ফুটবলের সব আঙ্গিকের দৃষ্টিকোণে কিছুটা হলেও এগিয়ে থাকবে এই স্পেনের তুলনায়। তবে স্বয়ং রেনাস মিশেলের সময় হল্যান্ড যে ফুটবলটা খেলে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল বিশ্ববাসীর, সেই 'ডায়মন্ড ফুটবল'টা আরও উন্নত, পরিশীলিত মাত্রায় খেলছে স্পেনীয়রা।

গত দুই দশকের মধ্যে ফুটবলের যাবতীয় বিবর্তন, পরিবর্তন সম্পন্ন হয়েছে। যাবতীয় পরিবর্তনের সূতিকাগার ইউরোপ, ইতালি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানিতেই চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তার সুফল ভোগ করে বাকি ইউরোপ ও বিশ্ববাসী। এই সব পরিবর্তনের সঙ্গে অসাধারণ সঙ্গত করে স্পেন গড়ে তুলেছে নিজস্ব এক ফুটবল ঘরানা যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। পজেশনাল ও পজিশনাল ফুটবলের মিশেলে গোটা মাঠকে স্প্যানিস আর্মাডা নিজেদের লীলাভূমি করে তুলেছে। ইচ্ছে মতো পাস খেলছে, ওপেন স্পেস তৈরি করছে, হারিয়ে যাওয়া উইং প্লেকে ছান্দসিক মহিমায় ফিরিয়ে এনেছে। এক কথায় ফুটবল মাঠটাকে যেন দাবাবোর্ড বানিয়ে ফেলেছে। সবকিছু হচ্ছে জ্যামিতিক নিয়মে, উদ্ভাবনী সৃজনবৈচিত্র্যে। না হলে বিশ্ব ফুটবলে দ্বিতীয় ঐতিহ্য-গরিমামন্ডিত দেশ ইতালিকে নিয়ে একেবারে ফাইনালে কেউ ওভাবে ছেলেখেলা করতে পারে!

স্পেন বোধহয় যাবতীয় অহং গরিমা, প্রতিশোধস্পৃহা তুলে রেখেছিল ফাইনালের জন্যই। গ্রুপ লিগ থেকে শুরু করে সেমিফাইনাল পর্যন্ত মোটামুটি পার্সেন্টেজ অথচ প্রেসিং ফুটবল খেলে এক বা দুই গোলে জিতছিল প্রতিটি ম্যাচ। যেন জিতলেই চলবে, চিত্তাকর্ষক খেলে বেশি গোল করার দরকার নেই। সমালোচনায় জেরবার স্প্যানিস আর্মাডা ফাইনালে ঘূর্ণীঝড় হয়ে আছড়ে পড়েছিল ইতালির রক্ষণে। জগৎ চন্দ্রহার ইতালির 'ক্যাটালে মত্ত', 'সুইসবোল্ট' ডিফেন্স ভেঙে চৌচির স্পেনের বল্গাহীন আক্রমণে। 'এল নিনো' 'টর্নেডো'র সঙ্গে তুলনা টানা হচ্ছে জাভি, ইনিয়েস্তা, টোরেসদের ত্রিফলা আক্রমণকে। দুপাশ থেকে 'সাপোর্টিং প্লে' খেলছে ফাব্রোগাস ও জারি আলাপ্পো। জমাট রক্ষণভাগ ও দুর্ভেদ্য গোলকিপার তথা অধিনায়ক কাসিয়াস। অন্য গ্রহের টিম বলে ভয় হোত এই স্পেনকে।

সমাবেশ সমাচার

কাঞ্চনতার শাখার বার্ষিক উৎসব

গত ২৬ জুন আর এস এসের মালদা জেলার গৌড়খণ্ডের কাঞ্চনতার শাখার বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই বার্ষিক উৎসবে উপস্থিত ছিলেন পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈত চরণ দত্ত এবং উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক গোবিন্দ ঘোষ সহ উত্তরবঙ্গের সমস্ত বিভাগ প্রচারকেরা। কাঞ্চনতার মহারাজপুর হাইস্কুলের শাখার মাঠকে এইদিন সাজানো হয়। ১০১ জন তরুণ ও বালক স্বয়ংসেবকের শারীরিক প্রদর্শনীর মধ্যে দণ্ড, ব্যায়াম যোগ, সূর্যনমস্কার সহ নিযুদ্ধ ও সমতা স্বয়ংসেবকরা দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করে। উত্তরবঙ্গের বিভাগ প্রচারকদের একদিনের বৈঠকও ওইদিন কাঞ্চনতারে অনুষ্ঠিত হয়। কাঞ্চনতার শাখার বার্ষিক উৎসবে বক্তব্য রাখেন ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত। তিনি শাখার মধ্যে দিয়ে সংস্কার যুক্ত ব্যক্তি নির্মাণ করে রাষ্ট্রগঠনে সহায়তা হয় বলে মনে করেন। স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষে স্বয়ংসেবকরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে স্বামীজীর সেবা ত্যাগ ও হিন্দুত্বের আদর্শ ছাড়িয়ে দেবে বলে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাঞ্চনতার গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি জয়েন্ট বিডিও রঘুনাথ দাস। তিনি তাঁর বক্তব্যে সঙ্ঘের কাজের সাফল্য কামনা করেন ও নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজের কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন।

সেবিকা সমিতির গ্রীষ্মকালীন বর্গ

গত ১১ জুন থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উত্তরবঙ্গ সম্ভাগের প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষের ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ বর্গ শিলিগুড়ির যোগমালী সারদা শিশুতীর্থে সম্পন্ন হলো। বর্গের উদ্বোধন করেন মোহনানন্দ আশ্রমের পূজ্য স্বামীজী শ্যামানন্দ মহারাজ। প্রধান বক্তা ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈত চরণ দত্ত। উত্তরবঙ্গ ৬টি জেলা থেকে মোট ৭৩ জন শিক্ষার্থী আসেন। অসম ও ত্রিপুরা সহ পশ্চিমবঙ্গের মোট ৭ জন শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ দেন। অধিকারী, কার্যকর্ত্রী, প্রবন্ধিকা নিয়ে মোট ১৮ জন উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় অধিকারী সমিতির অখিল ভারতীয় সহকার্যবাহিকা সুলভাতাঈ, অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ সুনীতা হলদেকর শিক্ষার্থীদের মার্গদর্শন করান। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, সুনীলপদ গোস্বামী, অজিত প্রসাদ মহাপাত্র, সত্যপদ পাল, বিমলকৃষ্ণ দাস, নির্ভয়কান্তি ঘোষ, মনোরঞ্জন মণ্ডল, গৌতম সরকার ও গৌতম সেনগুপ্ত বৌদ্ধিক প্রদান করেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সঞ্চালিকা মুক্তিপ্রদা সরকার, প্রান্ত কার্যবাহিকা ঋতা চক্রবর্তী, উত্তরবঙ্গ সম্ভাগ সঞ্চালিকা রীনা সেনচৌধুরী, কার্যবাহিকা অনুলেখা সরকার। বর্গে ছিলেন সহ কার্যবাহিকা পুতুল শর্মা অন্যান্য সেবিকাদের সহযোগিতায় বর্গ পরিচালনা করেন। ২৬ জুন সেবিকাদের পথসঞ্চলন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বাঘাযতীন পার্ক ময়দান থেকে এই সঞ্চলন বের হয়ে হাকিমপাড়ায় শেষ হয়। সমারোপ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অধ্যাপিকা শীলা ঘোষ।

গত ১৩ মে বিশ্ব মাতৃত্ব দিবস উপলক্ষে এর উদ্‌যাপন কমিটি উলুবেড়িয়ার এক অভিনব অনুষ্ঠানে সমস্ত মা'কে সম্মান জানিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিশিষ্ট সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশেষ অতিথি হিসেবে সাহিত্যিক সুমিত্রা ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

হুগলীতে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

হুগলী সংস্কৃত পরিষদের সহযোগিতায় সংস্কৃত ভারতী গত ১৪ জুন থেকে দশদিনব্যাপী হুগলী মিলন সিনেমার কাছে জয় ফার্নিচার ভবনে দুটি সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির অনুষ্ঠিত হলো। শতাধিক সংস্কৃত অনুরাগী শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষক ছিলেন সব্যসাচী দলপতি।

শিবিরের সমাপ্তি হয় গত ২৩ জুন। কেবলমাত্র দশদিনে সংস্কৃত ভাষা শিখে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা গান, নাটক ইত্যাদি

সংস্কৃত ভাষায় প্রদর্শন করে দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন।

সমাপ্তি কার্যক্রমে সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক গৌরচন্দ্র গড়াই, প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃত ভারতীর প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ। মাধ্যমিক স্তরে সংস্কৃত আবশ্যিক করার দাবি জানান বক্তারা। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক হুগলী সংস্কৃত পরিষদের সভাপতি সুনীলেন্দু ভট্টাচার্য।

হরিরামপুরে পরাবর্তন

গত ২ জুলাই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ধর্ম জাগরণ সমন্বয় বিভাগের প্রচেষ্টায় ৫৫টি পরিবারের ১৭১ জন সদস্য খৃস্টানধর্ম থেকে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। ৬টি গ্রামের এই পরিবারগুলি হিন্দুধর্ম থেকে এক সময়ে প্রলোভনে খৃস্টান ধর্মে চলে গিয়েছিলেন। হরিরামপুর হিন্দু মিলন মন্দিরের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে খৃস্টান সদস্যরা পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরে এলেন শুদ্ধি যজ্ঞের মাধ্যমে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ এই পরাবর্তন কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। স্থানীয় অধিবাসীরা নতুন করে ফিরে আসা বন্ধুদের সাদরে বরণ করে নেন। সকলে মিলে মঙ্গলঘট নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম পরিক্রমা করেন। সন্ধ্যায় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রচুর মানুষের ভিড় ছিল। আরতি ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে রাত্রে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উল্লেখ্য, দিনাজপুর, মালদা সহ উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সের বনবাসী বন্ধুদের মধ্যে জাগরণ শুরু হয়েছে। তারা ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। অনেক বনবাসী স্বধর্মে ফিরে আসতে চায় কিন্তু সেই কাজের জন্য আর্থিক পরিকাঠামো না থাকায় কাজ থমকে রয়েছে। ধর্মজাগরণের পক্ষ থেকে প্রান্ত সংযোজক গঙ্গাপ্রসাদ মুর্মু, প্রান্ত প্রমুখ বিদ্যুৎ রায় ছাড়াও সুনীল টপ্পো, বিমল ওঁরাও, চন্দ্রপতি চিক, বরিষ্ঠ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

রক্তদান শিবির

গত ১ জুলাই শ্রীরামপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন স্থানে বিগত বছরের মতো এবারেও হুগলি ভারতমাতা সেবাসঙ্ঘের উদ্যোগে এবং লায়ন্স ক্লাব, কলকাতার সহযোগিতায় আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ৪০ জন বিভিন্ন পেশা এবং বয়সের মানুষ রক্তদান করেন। এই শিবিরে অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিষয়ে বিভিন্ন বক্তার মননশীল ভাষণ ও ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের যথাযথ গুরুত্ব সহ মূল্যায়ণ। এবছর গুণীজন সম্বর্ধনায় নিরলস সমাজসেবী জয়দেব নাগ (নাড়ুদা)-কে সম্মানিত করা হয়। সাম্মানিক সামগ্রীগুলি তাঁর হাতে তুলে দেন সাংসদ (চুঁচুড়া লোকসভা) ডাঃ রত্না দে-নাগ এবং উপস্থিত ব্যক্তিগণের সামনে মানপত্রটি পাঠ করেন সঙ্ঘের সভাপতি লব্ধ প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক ডাঃ মোতিলাল চট্টোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য সংগৃহীত রক্ত দি থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় থ্যালাসেমিয়া রোগীদের চিকিৎসার্থে ব্যবহার করা হবে। সঙ্ঘের এই উদ্যোগ অকুণ্ঠভাবে প্রশংসিত হয়।

শিবিরে রিষড়া প্রেমমন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ চুনীলাল চক্রবর্তী, বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির তপন নাগ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থেকে কর্মকর্তা এবং কর্মীগণকে সমাজসেবায় উৎসাহিত করেন।

মেধা পুরস্কারে সম্মানিত দুই ছাত্রী

গত ৩০ জুন শনিবার মালদা কালেক্টারি বিল্ডিং-এ ২০১১ সালের ডঃ বি আর আম্বেদকর জাতীয় মেধা পুরস্কার প্রদান করা হয়। জেলা অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তর জানিয়েছে, ২০১১ সালের মাধ্যমিকের ফলের ভিত্তিতে দেশের ২৫০ জন তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত ছাত্রছাত্রী মেধা পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন। তার মধ্যে মালদা জেলার দু'জন ছাত্রী এই পুরস্কার পেলেন। ওইদিন জেলা শাসক শ্রীমতী অর্চনা ও সভাধিপতি উজ্জ্বল চৌধুরী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে মালদা শহরের বর্লো গালর্স হাইস্কুলের দূর্বাশ্রী দাস (প্রাপ্ত নম্বর ৮০০-র মধ্যে ৭৩২) এবং দীপান্বিতা দাস (৭৩১)-কে ১০,০০০ টাকা ও একটি মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়। দুই ছাত্রী আগামী দিনে ডাক্তার হয়ে সমাজের সেবা করতে চান বলে জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য দীপান্বিতা দাস কাঞ্চনতার গ্রামের ছাত্রী। স্বভাবতই গ্রামের মেয়ের এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে গ্রামবাসীদের মধ্যে খুশির পরিবেশ।

শোক সংবাদ

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির মালদা নগর শাখার মুখ্য শিক্ষিকা কুমারী জ্যোৎস্না সাহার পিতৃদেব মঙ্গল সাহা (৬১) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন।

গত ৪ জুন মালদা সদর হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দেবদর্শন বারবার সিন্ধু দর্শন একবার

।। লে থেকে ফিরে বিজয় আঢ্য ।।

সিন্ধু দর্শন উৎসব— ভক্তি, শক্তি ও মোস্তি-র মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় একাত্মতাকে পুষ্ট করার উৎসব। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সকল যাত্রীকে স্বাগত জানিয়ে উৎসবের তাৎপর্য বিশদ ভাবে তুলে ধরলেন উৎসবের মুখ্য উদ্যোক্তা ইন্দ্রেশকুমার।

সিন্ধু দর্শন উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

গত ২৩ থেকে ২৫ জুন লাদাখের লে শহরে সিন্ধু দর্শন মহোৎসব হয়ে গেল। রাষ্ট্রীয় একাত্মতা জাগরণের উদ্দেশ্যেই এই উৎসবের আয়োজন। সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় ৫০০ যাত্রী এবারের উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সব থেকে বেশি যাত্রী এসেছেন দিল্লী, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট থেকে। এবারের এই উৎসব ১৬তম। ১৯৯৭ সালে এন ডি এ সরকারের তত্ত্বাবধানে এই উৎসব শুরু হলেও ইউপিএ সরকারের অসহযোগিতার কারণে ক্রমশ তা প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। পরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও লাদাখ কল্যাণ সঙ্ঘ (LADAKH PHANDEY TSOGSPA, LEH)-এর যৌথ উদ্যোগে এই উৎসবে নতুন করে প্রাণসঞ্চার হয়।

লাদাখ কল্যাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে ২৩ জুন বিকেলে লে শহরে চোগলামসার-এ ভারতীয় বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে স্বাগত উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। স্থানীয় ছোট ছোট মেয়েরা প্রত্যেক যাত্রীকে সিল্কের কাপড়ের পাট্টা গলায় পরিয়ে দিয়ে স্বাগত জানায়। লাদাখের যুবক-যুবতীরা স্থানীয় ভাষায় গীত পরিবেশন ও গীত-বাদ্য সহ নৃত্য প্রদর্শন করে। প্রত্যেক প্রদেশের যাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলের সদস্য ইন্দ্রেশকুমারজী ছিলেন এই অনুষ্ঠানের মুখ্য বক্তা। মূলত তাঁরই তৎপরতায় সিন্ধু দর্শন মহোৎসবের সূচনা ও ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। জম্মু, কাশ্মীর উপত্যকা এবং লাদাখ— এই তিনটি ক্ষেত্রের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার উল্লেখ করে জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষায় তিনি আহ্বান জানান। এই তিন ক্ষেত্রের সীমান্তেই পাকিস্তান ও চীন ভারতকে আক্রমণ করার জন্য ওঁৎ পেতে বসে রয়েছে। সুযোগ পেলেই সৌজন্যের মুখোশ খুলে ভারতের উপর আক্রমণ করবে। যতটা সম্ভব এদেশের ভূভাগ দখল করে নেবে। জোজিলা পাসের মতো দুর্গম পথ অতিক্রম করে এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সকল যাত্রীকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, এই জাগ্রত সচেতনতাই রাষ্ট্রীয় একাত্মতাকে পুষ্ট করবে। তিনি সকল যাত্রীকেই স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সামান্য কিছু জিনিস কিনতেও অনুরোধ করেন যাতে এই দুর্গম এলাকার সাধারণ মানুষেরা একাত্মতা অনুভব করেন। এই অনুষ্ঠানের অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ভন্তে টগডাল রিমপোচে, রিনচেন শাস্ত্রী প্রমুখ লাদাখের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

স্থানীয় মানুষেরা নিজস্ব বেশে নৃত্য পরিবেশন করছে।

২৪ জুন সকাল ১০টায় সিন্ধু নদীর তীরে সিন্ধুঘাটে ১৬তম সিন্ধু দর্শন উৎসবের আয়োজন হয়। উদ্যোক্তা লাদাখ কল্যাণ সঙ্ঘ। ১৯৯৭ সালে সিন্ধুঘাটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এনডিএ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদবানী। এই উৎসবে এসেছেন তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীও। যাত্রীরা সিন্ধু নদীতে স্নান করে পূজাপাঠ ও দান-ধ্যান করে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। সব মিলিয়ে এই উৎসবে প্রায় ৫০০০ দর্শক উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় মানুষদের বিভিন্ন গোষ্ঠী নৃত্য-গীত ও বাদ্যের মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরেন। ইন্দ্রেশকুমারজী ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভগৎ সিং কোশিয়ারি। তিনি বলেন, কৈলাস ও মানস সরোবর লাদাখ থেকে অতি সহজেই যাওয়া যায়। ডেমচক থেকে ১০০ কিলোমিটার এগোলেই হিন্দুদের পরম পবিত্র তীর্থভূমি কৈলাশ ও মানস সরোবর যা ভগবান শিবের বাসস্থান হিসেবে পূজ্য। মানস সরোবরই গোমতী, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্রের উৎস। হিন্দুদের এই

উৎসবের মঞ্চে রয়েছেন ইন্দ্রেশকুমারজী (ডান দিক থেকে), উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভগৎ সিং কোশিয়ারি প্রমুখ।

পবিত্র তীর্থভূমিকে চীনের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য ভারত সরকারের কাছে তিনি দাবী জানান। এইজন্য তিনি সকলকে সংগঠিত হতে বলেন। স্বামী যতীন্দ্রনাথ গিরি মহারাজ, নির্বাসিত তিব্বতী সরকারের সাংসদ আচার্য এসে পহনটসগ (Eshey Phontsag) প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। উৎসবের শেষ লগ্নে সহভোজ ছিল একাত্মতার এক অনন্য অনুভূতি। দেশের এক প্রত্যন্ত দুর্গম এলাকায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সমাবেশ এই উৎসবকে এক অন্যমাত্রা দান করেছিল— এককথায় যা অনন্য।

প্রতি বছর এই উৎসব ২৩ থেকে ২৫ জুন হয়ে থাকে। সকল যাত্রীকেই জম্মুতে ১৯ জুন পৌঁছাতে হবে। কেননা ২০ জুন তারিখের সকাল ৭টার মধ্যেই লে-র উদ্দেশে রওনা দিতে হয়। এদিন রাত্রিবাস হবে কাশ্মীর উপত্যকার কোনও স্থানে। পরের দিন (২১ জুন) কারগিলে রাত্রিবাস। ২২ জুন সকালে কারগিল থেকে লে-র উদ্দেশে রওনা। ২৩-২৪-২৫ জুন লে। ২৫ জুন ফেরার পালা। ২৮ জুন জম্মু। যারা এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে চান তাদের ১৫ মে-র মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। বিশদ সংবাদের জন্য যোগাযোগ করতে হবে— সিন্ধু দর্শন যাত্রা সমিতি, মাধবকুঞ্জ, বেদমন্দির পরিসর, অম্বফলা, জম্মু। দূরভাষ- ০৯৪১৯২২২৬৩৮/০৯৪১৯১১০৯৪০, e/mail:spa1794@gmail. com। শুধু যাত্রার কয়েকটি দিনের জন্য খরচ হবে মাথাপিছু ৬৫০০-৭০০০ টাকা।

লে থাকার সময় যাত্রীরা অনেকেই খারদুংলা পাস (১৮৫০০ ফুট), প্যাঙ্গন লেক (Pangong Lake), হেমিস গুম্ফা, শান্তি স্তুপ প্রভৃতি স্থান ঘুরে আসতে পারেন। এজন্য অবশ্যই সাহস ও শারীরিক সুস্থতা প্রয়োজন। প্রয়োজন স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষের অনুমতিও। এইসব স্থানে ভ্রমণের জন্য অতিরিক্ত প্রায় ২৫০০ টাকা খরচ হবে। ২৫ জুন রাত্রিতে লে-র পোলো গ্রাউন্ডে আয়োজিত হয়েছিল একটি সাংস্কৃতিক উৎসবের। স্থানীয় মানুষেরাও এই অনুষ্ঠানে সঙ্গে দেশের অন্য প্রান্তের মানুষেরা গীত-বাদ্য ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি তুলে ধরেন। সব মিলিয়ে ‘দেবদর্শন বার বার, সিন্ধু দর্শন একবার’— উৎসবের এই ধ্বনি তাই শুধু যথার্থই নয়, সার্থকও।

সিন্ধু দর্শনের (২০১২) চারজন যাত্রী।

শব্দরূপ-৬৩৩ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১	■	■	২		৩		■
	■	■		■		■	■
৪	৫			■	৬	৭	
■		■	■	■	■		■
■		■	■	■			■
৮		৯	■	১০			১১
■	■		■		■	■	
■	১২				■	■	

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. সমুদ্রমন্থনকালে দেবতারা একে মন্থন-রজ্জু হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন, প্রথম দুয়ে সমাপ্তি, ৪. ঋষি বিশেষ, ব্যাসদেবের পিতা, ৬. স্কন্ধকাটা, ভুত বিশেষ, মস্তকহীন দেহ, ৮. বৈদ্যকশাস্ত্রকার বিশেষ ('— সংহিতা'), ১০. সমুদ্র; বাল্মীকি মুনির পূর্বনাম, ১২. কণ্ঠ হতে জানু পর্যন্ত লম্বিত পঞ্চবর্ণময়ী মালা।

উপর-নীচ : ১. "তুমি— স্বরূপ, স্বগুণ, দয়াল, ভয়াল হরি হে"; নিরাকার, ২. কিরীট; চূড়া, ৩. নিরীশ্বরবাদী; বেদে বা শাস্ত্রোক্ত ধর্মে অবিশ্বাসী, ৫. রাজস্ব, সরকারকে প্রদেয় খাজনা, ৭. কাক চড়াই ইত্যাদি পাখি যারা মানুষের ত্যক্ত খাদ্য খায়, ৯. রাজা হর্ষবর্ধনের রাজধানী, বর্তমান জুনাগড়, ১০. মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী ১১. পদ্মাপুরাণোক্ত মনসাদেবীর গীত।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৩০
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	■	পু	ষ্প	শ	র	■	ম
অ	র	ণ্য	■	■	জ	■	নী
■	বি	■	প	■	নি	ক	ষা
■	ন	ক্ষ	ত্র	■	■	ং	■
■	ন্দ	■	■	না	ভা	স	■
প	ন	স	■	গ	■	ব	■
র্জ	■	রো	■	■	স	তী	শ
ন্য	■	জ	ল	ন্ধ	র	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

■ ৬৩৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ৬ আগস্ট, ২০১২ সংখ্যায়

মঙ্গলনিধি

ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানের ব্যয়ের কিছুটা অংশ সামাজিক স্বার্থে সমর্পণের প্রথা হিন্দু সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। বিভিন্ন ধরনের বিবর্তনের পরও সেই প্রথা আজও 'মঙ্গলনিধি' হিসাবে প্রবহমান। সম্প্রতি 'মঙ্গলনিধি' সমর্পণের কয়েকটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল হাওড়া ও মালদা জেলায়।

হাওড়া জেলার ফুলেশ্বরের স্বয়ংসেবক পিন্টু পাত্রের বিবাহ উপলক্ষে গত ১০ ফেব্রুয়ারি বধূবরণ অনুষ্ঠানে তাঁর পিতা বিশ্বনাথ পাত্র ও মাতৃদেবী শ্রীমতী নয়নতারা পাত্র সম্মিলিত ভাবে 'মঙ্গলনিধি' সমর্পণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সমিতির পক্ষে এই নিধি গ্রহণ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলি বিভাগ প্রচারক প্রফুল্ল ঘোষ।

*　*　*

একই দিনে হাওড়া জেলার লতিবপুরের স্বয়ংসেবক রবীন মণ্ডল তাঁর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বিবাহ বাসরে সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক ডাঃ সনৎ কুমার বসুমল্লিক-এর হাতে 'মঙ্গলনিধি' প্রদান করেন।

*　*　*

১৬ এপ্রিল কুলগাছিয়ার স্বয়ংসেবক অভিজিৎ আঢ্যের বিবাহ উপলক্ষে তার মাতৃদেবী শ্রীমতী শ্যামলী আঢ্য বধূবরণ অনুষ্ঠানে হাওড়া জেলা সঙ্ঘচালক রুধির রঞ্জন নায়ক-এর হাতে মঙ্গলনিধি সমর্পণ করেন।

*　*　*

গত ১৩ মে হাওড়া জেলারই স্বয়ংসেবক সুজিত খেটোর বিবাহ উপলক্ষে পিতা বিভূতিভূষণ খেটো এবং মাতৃদেবী সুমিত্রা খেটো বধূবরণ অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সেবাপ্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষের হাতে মঙ্গলনিধি সমর্পণ করেন।

*　*　*

আর এস এসের মালদা জেলার কৃষ্ণনগর খণ্ডের বৌদ্ধিক প্রমুখ কিশোর কুমার সরকার তাঁর বৌভাতে মঙ্গলনিধি স্বরূপ ২০০১ টাকা জেলা সম্পর্ক প্রমুখ রাজু কর্মকারের হাতে তুলে দেন। গত ২৮ জুন তাঁর কৃষ্ণপুরের বাড়িতে অনুষ্ঠানে এই অর্থ প্রদান করেন।

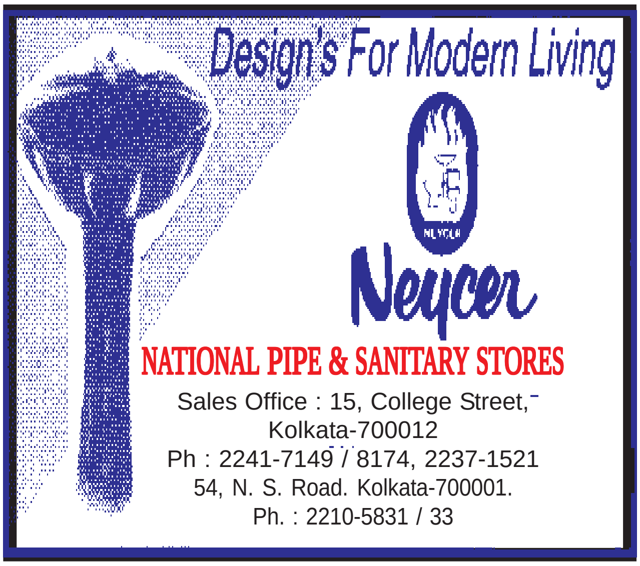

।। চিত্রকথা ।। মহাভারত ।। ৪

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

লাদাখ জম্মু-কাশ্মীর থেকে আলাদা থাকতে চায় : রিনচেন শাস্ত্রী

সম্প্রতি লাদাখের লে শহরে সিন্ধুদর্শন উৎসব হয়ে গেল। লাদাখ কল্যাণ সঙ্ঘ (Ladakh Phandey Tsogspa)-এর উদ্যোক্তা। রিনচেন শাস্ত্রী (Rinchen Sharstri) এই কল্যাণ সঙ্ঘেরই সভাপতি। উৎসবের নানা কাজের ফাঁকে তিনি স্বস্তিকা'র জন্য একান্ত সাক্ষাৎকারে যা বললেন তা এখানে পুরোপুরি তুলে ধরা হলো। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন স্বস্তিকার সম্পাদক বিজয় আঢ্য।

❑ **লাদাখ সম্পর্কে কিছু বলুন।**

❑ বহুদিন ধরে আমরা এই অঞ্চলের অধিবাসীরা একঘরে ছিলাম। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে প্রায় কোনও যোগাযোগই ছিল না। ১৯৭৪-এর পর রাস্তাঘাটের সামান্য উন্নতি হলে কিছু কিছু পর্যটক আসতে শুরু করেন। এখন পর্যটকদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। প্রায় ন' মাস রাস্তা খোলা থাকে। এখানকার মানুষের বাকি দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচয় আত্মীয়তা হচ্ছে।

❑ **লাদাখের প্রশাসনের কাজকর্ম কেমন ভাবে চলে?**

❑ লাদাখ জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। স্বতন্ত্র থাকতে চায়। জম্মু-কাশ্মীরের সঙ্গে থাকতে চায় না। কেননা এই অঞ্চলের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রশাসনের কাজের সুবিধার জন্য লাদাখ-কে দুটি জেলায় ভাগ করা হয়েছে— লাদাখ ও কারগিল। লাদাখের একাংশ— লাহুল ও স্পিতি-কে হিমাচল প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। লাদাখের জনসংখ্যা তিন লক্ষ। লাদাখ জেলার ৮৫ শতাংশ মানুষই বৌদ্ধ, বাকি ১৫ শতাংশ মুসলিম। কারগিলে এটা আবার সম্পূর্ণ বিপরীত— ১৫ শতাংশ বৌদ্ধ আর ৮৫ শতাংশ মুসলিম।

এই অঞ্চলের 'সিকিউরিটি' বা নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব রয়েছে আর্মির কোর কম্যান্ডার (Core-commander)-এর উপর।

❑ **এই অঞ্চলের মানুষের জীবিকা কি?**

❑ বেশিরভাগ মানুষই— ৬০ শতাংশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ মানুষ সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত। বাকি ১৫-২০ শতাংশ মানুষ চাষবাস করে থাকে। জো (বার্লি) আর গম প্রধান শস্য। চাপাটি বা রুটিই প্রধান খাদ্য। মেয়েরা সাধারণত ঘর-গেরস্থালীর কাজকর্মই করে থাকে।

❑ **এখানকার সংস্কৃতি সম্পর্কে দু'-চার কথা যদি বলেন।**

❑ লাদাখের সংস্কৃতি মূলত তিব্বতী সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। ১৮৩৪ সালে রাজা তণ্ডুকা নামগিয়াল পর্যন্ত লাদাখ স্বতন্ত্র ছিল। তারপর রাজা গোলাপ সিং-এর আমলে জম্মু-কাশ্মীরের সঙ্গে যুক্ত হয়। লাদাখিরা বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসী। ভগবান বুদ্ধের বহু রূপের উপাসক। কর্মফল ও পুনর্জন্মবাদ মানে। এদিক থেকে সনাতনীদের সঙ্গে মিল আছে। বাদ্যের তালে তালে নেচে গেয়ে আমরা উৎসব পালন করে থাকি।

❑ **লাদাখের সামাজিক রীতি-নীতি নিয়ে কিছু বলুন।**

❑ লাদাখে এক সময় প্রতি পরিবার থেকে একজন লামা (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু জনসংখ্যা কমে যাওয়ার আশংকায় স্বয়ং দলাই লামার নির্দেশে এখন এই প্রথা আর বাধ্যতামূলক নয়। তবে ইচ্ছে হলে যে কেউ লামা হতে পারেন। এখানে দহেজ বা পণপ্রথা নেই। বরং উল্টো— কন্যা পক্ষকে দিতে হতে পারে। এছাড়া আগে যে 'দুই ভাই, এক বিবি' প্রথা চালু ছিল আজ আর তা নেই।

❑ **এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা কেমন?**

❑ এখানকার জলবায়ু খুবই শীতল। তাপমাত্রা ৫-৭ ডিগ্রির মধ্যে সাধারণত ওঠানামা করে। শীতকালে যা মাইনাস ৫০ ডিগ্রি হয়ে যায়। বাতাসে অক্সিজেনের ভাগ কম— নাইট্রোজেন বেশি। ফলে মস্তিষ্কের উপর এর প্রভাব পড়ে। তাই শিক্ষা-দীক্ষায় তেমন উন্নত নয়। ছেলে-মেয়েরা স্কুলে গেলেও ড্রপ-আউটের সংখ্যা খুব বেশী। সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা লে-এর কাছে খোলা হয়েছে।

❑ এই একান্ত সাক্ষাৎকারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

❑ জুলে (নমস্কার)।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
16 July - 2012

দাম : ৭.০০ টাকা